ইউনিট ৬

খোলাফায়ে রাশেদূন

খোলাফায়ে রাশেদূন ঃ ধর্মীয় দৃষ্টিতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রধান প্রশাসনিক কাঠমো হল খিলাফত। ইসলামী সমাজে নবুয়তের পর খিলাফতের মর্যাদা। খলীফা শব্দটি একবচন, বহুবচনে খোলাফা (خلفاء) , এর উৎপত্তি খিলাফত (خلافة) শব্দ থেকে। খিলাফত-এর শাব্দিক অর্থ প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ত।

রাসূল করীম (স.)-এর ইন্তিকালের পর ইসলামী প্রজাতন্ত্রে তাঁর আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী যিনি ধর্মীয় ও পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী হন তিনি, তার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, শাসনকার্য পরিচালনা করেন। নিজ নিজ যুগে উম্মতের নেতৃত্ব দেন, তাঁকে খলীফা আর তাঁর দায়িত্বকে খিলাফত বলা হয়। এ সম্পর্কে নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন "তোমাদের আগে বনী ইস্রাঈলের নবী ও রাসূলগণ রাজ্য পরিচালনা করতেন। এক নবীর ইন্তিকালের পর অন্য নবী তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করতেন। কিন্তু এখন থেকে আর কোন নবী ও রাসূল আসবে না। তাই আমার পরে খলীফাগণ তোমাদের নেতৃত্ব দিবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

মহানবীর খলীফাগণ বিচার সভায় ছিলেন ন্যায়বিচারক উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে ছিলেন উপযুক্ত উপদেশদাতা। সৎ কৌশল অবলম্বনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কৌশলী ছিলেন, যুদ্ধের রণাঙ্গনে সুনিপুণ সেনাপতি ও সর্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন। এ ইউনিটে খোলাফায়ে রাশেদূন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১: খোলাফায়ে রাশেদূনের পরিচয়
❖ পাঠ-২ খোলাফায়ে রাশেদূন সরকারের বৈশিষ্ট্য
❖ পাঠ-৩ খোলাফায়ে রাশেদূন সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো ও বিচার বিভাগ
❖ পাঠ-৪ খোলাফায়ে রাশেদূনের নির্বাচন প্রক্রিয়া ও মজলিসে শূরা
❖ পাঠ-৫ খোলাফায়ে রাশেদূনের রাজস্ব ব্যবস্থা
❖ পাঠ-৬ খোলাফায়ে রাশেদূনের সামরিক ব্যবস্থা
❖ পাঠ-৭ হযরত উমরের প্রশসানিক ব্যবস্থা

পাঠ ঃ ১

খোলাফায়ে রাশেদূনের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ◆ খোলাফায়ে রাশেদূন কারা তার বিবরণ দিতে পারবেন;
- ◆ খলীফার মর্যাদা সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ◆ তাঁদের স্বভাব চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।

খোলাফায়ে রাশেদূনের পরিচয়

নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে চার খলীফার পরিচয় পেশ করা হল-

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পর যে চারজন মহৎ ব্যক্তি তাঁর যথার্থ প্রতিনিধিরূপে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তারা ইসলামের ইতিহাসে খোলাফায়ে রাশেদূন হিসেবে পরিচিত। তাঁরা হলেন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)। এ চারজন সাহাবী পরপর খলীফা হিসেবে (৬৩২-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ) প্রায় ত্রিশ বছর খিলাফতের আসন অলংকৃত করেন তাঁদের সম্বন্ধে রাসূলের বাণী : "আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু হযরত আবু বকর (রা.), আল্লাহর নির্দেশ পালনে সবচেয়ে কঠোর হযরত উমর (রা), অধিক লজ্জাবোধকারী হযরত উসমান (রা.) এবং সবচেয়ে বেশী ন্যায়বিচারক আলী (রা)।" (আল-হাদীস)

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোন কোন ঐতিহাসিক হযরত উমর ইবন আবদুল আযীযকে ইসলামের পঞ্চম খলীফা বলে অভিহিতো করেছেন। তিনি উমাইয়া শাসন-নীতিকে বর্জন করে ইসলামী নীতিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ইসলামী খিলাফতের নিয়ম অনুযায়ী খলীফা নির্বাচিত এবং দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন। তাই তিনিও খোলাফায়ে রাশেদারূপে গণ্য।

এক নজরে খোলাফায়ে রাশেদূন ও তাঁদের সময়কাল

খলীফা	খেলাফতের সূচনা	সমাপ্তি	সময়কাল
হযরত আবু বকর (রা.)	১৩ রবিউল আউয়াল ১১ হিঃ	২২ জুমাদাল উখরা ১৩ হিঃ	২ বছর ৩ মাস ৯ দিন
হযরত উমর (রা.)	২৩ জুমাদাল উখরা ১৩ হিজরী	২৬ যিলহজ্জ ২৩ হিজরী	১০ বছর ৬ মাস ৩ দিন
হযরত উসমান (রা.)	১ মুহাররাম ২৪ হিজরী	১৮ যিলহজ্জ ৩৫ হিজরী	১১ বছর ১১ মাস ১৭ দিন
হযরত আলী (রা.)	২৪ যিলহাজ্জ ৩৫ হিজরী	১৭ রমযান ৪০ হিজরী	৪ বছর ৮ মাস ২৩ দিন

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)

নাম ঃ নাম-আবদুল্লাহ, ডাকনাম-আবু বকর, উপাধি-সিদ্দীক ও আতীক। পিতার নাম-উসমান, আবু কোহাফা। মাতার নাম- সালমা।

জন্ম ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরায়শ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম পূর্ব জীবন ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বিরাট ব্যবসায়ী ও সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। সততা, সরলতা ও বিশ্বস্ততায় তাঁর খ্যাতি ছিল। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সহনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য মক্কাবাসী তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতো।

হযরত আবু বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও মূর্তি পুজা ও মদ্যপানকে ঘৃণা করতেন।
হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঃ
"জাহিলিয়াতের যুগেও হযরত আবু বকর (রা.) নিজের উপর মদ হারাম করেছিলেন।"

শৈশব থেকেই রাসূলে করীম (স.)-এর সাথে তাঁর গভীর ভালবাসা ও সদ্ভাব ছিল। তিনি রাসূলে করীম (স.)-এর বিশিষ্ট বন্ধুগণের অন্যতম ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ নবী করীম (স.)-এর উপর যখন ওহী নাযিল হয়, তখন হযরত আবু বকর (রা.) বাণিজ্য উপলক্ষে ইয়ামেনে ছিলেন। সফর থেকে ফেরার পর তিনি রাসূলে করীম (স.)-এর দরবারে হাযির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেন, "আমি যার নিকটই ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছি সে এ ব্যাপারে কম বেশী চিন্তা ভাবনা করেছে। কিন্তু যখনই আমি আবু বকর-এর নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করি, সে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়া সাথে সাথে তা গ্রহণ করেছে।" বর্ণিত আছে বয়স্কদের মাঝে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ।

সিদ্দীক উপাধি ঃ নবী করীম (স.)-এর মিরাজের ঘটনাকে যিনি সর্বপ্রথম সত্য বলে বিশ্বাস করেন তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রা.)। তাই তিনি "সিদ্দীক" উপাধিতে ভূষিত হন।

মদীনায় হিজরত

রাসূলের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্যলাভ ঃ মক্কার কাফির মুশরিকদের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাসূলে করীম (স.) আল্লাহর নির্দেশে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন এবং হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সফর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সাওর গুহায় অবস্থান ঃ রাসূলে করীম (স.) ও হযরত আবু বকর (রা.) -এর প্রথম মনযিল ছিল সাওর নামক গুহা এবং সেখানে তাঁরা তিন দিন অবস্থান করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا

"যখন কাফেররা তাঁকে বহিস্কার করেছিল এবং সে ছিল দু'জনের দ্বিতীয়জন। যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, তখন সে তার সঙ্গীকে বলল, বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন"। (সূরা আত-তাওবা : ৪০)

মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা ঃ হযরত আবু বকর (রা.) নবী করীম (স.)-এর পরামর্শে মদীনার মসজিদে নববীর জমির মূল্য পরিশোধ করেন এবং তাঁর দানের মধ্য দিয়েই মসজিদ নির্মাণ শুরু হয় এবং তিনি মসজিদ তৈরির কাজে পরম উৎসাহ সহকারে দৈহিক পরিশ্রমে অংশগ্রহণ করেন।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন ঃ হযরত আবু বকর (রা.) হিজরতের পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন এবং তিনি একজন উপদেষ্টা ও সুকৌশলী উযীর হিসেবে নবী করীম (স.)-এর সঙ্গী ছিলেন।

স্বভাব চরিত্র

হযরত আবু বকর (রা.) ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন স্বল্পভাষী, সাহসী, ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। সততা, ধর্মভীরুতা ও বদান্যতার ক্ষেত্রে ছিলেন অদ্বিতীয়। দানশীলতা ও সত্যবাদিতার জন্য তিনি যথাক্রমে আতীক ও সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত হন। ঈমানের দৃঢ়তা, কঠিন সংযম ও ন্যায়পরায়ণতা তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) অতীব ভদ্র ও নম্র-স্বভাবের ছিলেন। তিনি সাধারণ কাজ করতেও লজ্জাবোধ করতেন না। অনেক সময় ভেড়া ছাগল চরাতেন, তিনি জনসেবামূলক কাজ থেকে কখনও বিরত থাকেননি।

হযরত আবু বকর (রা.) সাধারণ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা হয়েও উষ্ট্রের চামড়া নির্মিত তাঁবুর গৃহে বাস করতেন এবং স্বীয় ব্যবসায়ের একমাত্র আয়ের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতেন।

তিনি একজন খাঁটি ধর্মভীরু মুসলমান হিসেবে সবার অগ্রে ছিলেন। দুঃস্থ মানবতার দুর্দশা লাঘব করার জন্য সর্ব প্রথম ইসলামে 'বায়তুলমাল' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন দুর্যোগের সময় একজন দৃঢ়চেতা রাষ্ট্র সংগঠক হিসেবে ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।

হযরত আবু বকর (রা.) পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি নিরাসক্ত ছিলেন। তিনি মুসলিম মিল্লাতকে বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করার জন্যই খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন ভাষণে বলেছিলেন যে, অন্য কেউ এ দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হবেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুরাগ ঃ হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আনুগত ছিলেন। বংশ মর্যাদা, যোগ্যতা ও নৈতিক আদর্শের জন্য আরব সমাজে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি নবী করীম (স.)-এর সুখে দুঃখে, বিপদে-আপদে ও শান্তি-সংগ্রামে তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করেন এবং তাঁর প্রতি অবিচল বিশ্বাসের প্রমাণ পেশ করেন।

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ

হযরত আবু বকর (রা.) ১১ হি. সালের ১৩ রবিউল আউয়াল খেলাফতর দায়িত্ব গ্রহণ করে। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সকীফা বানুসায়েদাতে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

তাঁর আমলে ইসলামের গণতান্ত্রিক রূপ বাস্তবায়তি হয়। তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খলীফা নির্বাচিত হন। অনুরূপভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সকল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের সময় বিশিষ্ট সাহাবাগণের সংগে পরামর্শ করতেন।

ইতিহাসে স্থান ঃ নবী করীম (স.)-এর তিরোধানে ইসলামী রাষ্ট্রে যে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল হযরত আবু বকর (রা.) তখন কিংকর্তব্য বিমূঢ় মুসলিম মিল্লাতকে সঠিক পথে পরিচালিত করে ইসলামকে ধ্বংস ও অবলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধার করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন- "তাঁর নম্রতা এবং একনিষ্ঠ অনাড়ম্বর জীবন, নীতিজ্ঞান, ইস্পাত কঠিন সংকল্প, অবিচল অধ্যবসায় এবং সর্বোপরি অটল বিশ্বাস প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ইসলামের ইতিহাসে তাঁর স্থান মহানবীর পরেই।"

নবী করীম (স.)-এর ইনতিকালের সুযোগে সাজাহ, তুলায়হা, মুসায়লামা ও আসওয়াদ আনসিসহ কতিপয় ব্যক্তি ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করেন। হযরত আবু বকর (রা.) উসামা এবং খালিদ প্রমুখ সেনাপতির মাধ্যমে তাদেরকে পরাজিত করেন এবং তাদেরকে ইসলামের পতাকা তলে আসতে বাধ্য করেন। হিরার শাসনকর্তা হরমুজ ও রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে পরাস্ত করে ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

হযরত উমর ফারূক (রা.)

নাম ও বংশ পরিচয় ঃ নাম- উমর (র); উপাধি-ফারূক। পিতার নাম- খাত্তাব। পরিচয়-উমর ইবনুল খাত্তাব।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের মতে হযরত উমর (রা.) হিজরতের ৪০ বছর পূর্বে ৫৮৩ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশব ও যৌবন

হযরত উমর (রা.) যৌবনের প্রারম্ভেই যুদ্ধ বিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশ তালিকা শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় আয়ত্ত করেন।

তিনি আরবের ওকায মেলায় কুস্তিতে লড়তেন, কিতাবুল আশরাফ গ্রন্থে উল্লেখ আছে "হযরত উমর (রা.) একজন মস্ত বড় পাহলোয়ান ছিলেন, অশ্বারোহী হিসেবে তাঁর পারদর্শিতা সর্বজনবিদিত।"

ঐতিহাসিক বালাযুরীর মতে "রাসূলে করীম (স.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির সময় সমগ্র কুরায়শ বংশে মাত্র সতের জন ব্যক্তি লেখা পড়া জানতো। হযরত উমর (রা.) এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।"

তিনি যৌবনের এক পর্যায়ে জীবিকা অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি সাধন করতে সমর্থ হন।

তিনি ব্যবসা উপলক্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করেছিলেন। ফলে অনেক জ্ঞানী-গুণির সাথে মেলামেশার সুযোগ পান। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর মধ্যে উন্নত ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা, অভিজ্ঞতা এবং বিচার বুদ্ধি ইত্যাদি গুণের সমাবেশ ছিল। আর তা ছিল তাঁর বিভিন্ন গুণীজনের সাথে মেলামেশার ফল।

ইসলাম গ্রহণ ঃ কুরাইশ সরদারদের মধ্যে হযরত উমর (রা.) ও আবু জাহল ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। রাসূলে করীম (স.) তাঁদের দু'জনের জন্য দোয়া করেন-

أللهم أعز الإسلام بإحد العمرين إما عمرابن هشام و إما عمر بن الخطاب.

"হে আল্লাহ ! ওমার ইবন হিশাম (আবু জেহেল) অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব এ দু'জনের একজনকে ইসলামে প্রবেশ করার তৌফিক দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।" আল্লাহ তা'আলা হযরত উমর (রা.)-কে গ্রহণ করেন।

বীর শ্রেষ্ঠ উমরের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে। তখন পর্যন্ত মাত্র ৪০ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল সাতাশ বছর। হযরত উমর ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রকাশ্যে মুসলমানগণ নামায পড়তে আরম্ভ করে। এ সময় মহানবী (স.) তাঁকে فاورق (ফারুক) উপাধিতে ভূষিত করেন। (আল ফারুক- শিবলী নোমানী)

হযরত উমর (রা.) -এর ইসলাম গ্রহণের পর হতে ইসলাম প্রচারের গতি তীব্র হয়। তিনি কাফিরদের একত্র করে স্বীয় ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। ফলে ইসলামের শক্তি ও মর্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হযরত উমর (রা.) মুসলমান হওয়ার পর মুসলমানগণ অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে হিজরত করেন। উমর (রা.) কাফেরদের কোন এক সভায় উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন- "আমি মদীনা যাচ্ছি, যে নিজের আপন মাতাকে কাঁদাতে চাও, ঐ উপত্যকার নিকটে আমার সাথে মোকাবিলা করবে ; তবে মনে রাখবে তাঁকে ফিরাবার সাহস কারো নেই।" হযরত উমর নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে গেলেন।

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "হযরত উমরের মুসলমান হওয়া ইসলামের বিজয় স্বরূপ। তাঁর হিজরত ছিল আল্লাহর সাহায্য স্বরূপ। তিনি ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। তাই তো আমরা তাঁকে হিজরতে, আযান প্রচলনে, বদরে, উহুদে, বানূ নাযীরের নির্বাসনে, খন্দকের যুদ্ধে, হোদায়বিয়ার সন্ধিতে, খায়বরের যুদ্ধে, মক্কা বিজয়ে, হোনায়েনের যুদ্ধে। তাবুক অভিযানে আবু বকরের খলীফা নির্বাচনে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে পাই।"

হযরত উমর (রা)-এর চরিত্র

হযরত উমর (রা.) ইসলামী জগতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। মহাজ্ঞানী, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, উত্তম ব্যবস্থাপনা, ন্যায়-বিচার, ধার্মিকতা, সরলতা, সত্যবাদিতা, সত্যেনিষ্ঠা পুজা, ধৈর্য ও সহনশীলতা ও কোমলতাসহ বহুমুখি গুণের অধিকারী ছিলেন।

হযরত উমর (রা.) সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। ইবনয় ও নম্রতার সাথে সারা রাত আল্লাহর ইবাদত করতেন। জাগতিক লোভ-লালসা ও জাঁক-জমক তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

হযরত উমর (রা.) মদীনার শহর ও শহরতলীতে গভীর রাতে বের হতেন এবং রাজ্যে কোন গরীব-দুঃখী আছে কিনা তা পরিদর্শন করতেন, প্রয়োজনে তিনি নিজের কাঁধে খাদ্য সামগ্রী বহন করে দীন-দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করতেন। এগুলো ছিল তাঁর জনসেবার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

হযরত উমর (রা.) 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত' তথা নবী সা. এর পদ্ধতি আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ ও সংরক্ষণ করতে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "হযরত উমর (রা.) -এর জীবন চরিত্র অল্প কথায় বলা যায়, সরলতা ও কর্তব্য জ্ঞান ছিল তাঁর জীবনাদর্শ, ন্যায়পরায়ণতা ও একনিষ্ঠতা ছিল তাঁর শাসনের মূলনীতি।"

তিনি ছিলেন সঠিক অর্থেই ন্যায়বিচারক। তিনি বিচার বিভাগকে দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য জ্ঞানীদের বিচারক নিযুক্ত করতেন। তাঁর ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারের খ্যাতি সর্বকালের জন্য উজ্জল দৃষ্টান্ত।

ইসলামী গণতন্ত্রের বীজ প্রথম অংকুরিত হয় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময়ে। আর তা পুর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে হযরত উমরের সময়কালে। তাঁর বলিষ্ঠ শাসন নীতি এবং প্রশক্ষিণ কার্যক্রম গণতন্ত্রেরর আদর্শে সুন্দর ও স্বার্থক হয়ে উঠেছিল।

এককথায় হযরত উমর (রা.) -এর মত বহুমুখী গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহসে বিরল। ন্যায়-পরায়ণতা, সত্য নিষ্ঠা, কোমলতা ও সংযমে তিনি ছিলেন নবী করীম (স.)-এর সার্থক প্রতিচ্ছবি।

হযরত উসমান (রা.)

নাম-উসমান, উপাধি- যুন্নূরাইন, পিতার নাম- আফফান, মাতার নাম- আরওয়া, যিনি রাসূল (স.)-এর আপন ফুফী উম্মে হাকিম ইবনতে আবদুল মুত্তালিব-এর কন্যা ছিলেন।

হযরত উসমান (রা.) কুরায়শ বংশের একটি বিখ্যাত শাখা বনু উমাইয়া গোত্রে রাসূল (স.)-এর হিজরতের ৪৬ বছর পূর্বে ৫৭৩/৫৭৬ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ রাসূল করীম (স.)-এর ইসলাম প্রচার কালীন সময়ে হযরত উসমান (রা.) -এর বয়স ছিল চৌত্রিশ বছর। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

যুন্নুরাইন উপাধি লাভ ঃ ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তাঁর জীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি রাসূল করীম (স.)-এর দু' কন্যাকে বিবাহ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রথমতঃ হযরত রুকাইয়া (রা.) -কে বিবাহ করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত উম্মে কুলসূমকে বিবাহ করেন। এ জন্য তাঁকে যুন্নূরাইন বা দু'টি আলোর অধিকারী' খেতাব প্রদান করা হয়।

হযরত উসমানের অবদান

মদীনায় হিজরতের পরিবেশ সৃষ্টি হল এবং রাসূল করীম (স.) সকল সাহাবাকে মদীনায় হিজরতের ইংগিত দিলেন। হযরত উসমান (রা.) ও তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে মদীনায় চলে গেলেন এবং তিনি হযরত আওস ইবন সাবিত (রা.) -এর অতিথি হলেন। রাসূল করীম (স.) তাঁর ও হযরত আওস (রা.) -এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে দিলেন। এই ভ্রাতৃত্ব উভয় পরিবারকে এত বেশী ভালবাসা ও একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল যে, হযরত উসমানের ইন্তিকালে হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) এক করুণ মর্সিয়া লিখেছেন।

সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান

রুমা কূপ ক্রয় ঃ মদীনা আগমনের পর মুহাজিরদের পানির কষ্ট দেখা দিল। সারা শহরে একমাত্র রুমা কূপের পানি পানোপযোগী ছিল। কিন্তু জনৈক ইয়াহূদী এ কূপটির মালিক ছিল। সে এটিকে নিজের উপার্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করছিল। হযরত উসমান (রা.) ১৮ হাজার দিরহাম দিয়ে এই কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন এবং মুসলমানদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

মসজিদ সম্প্রসারণ ঃ তৎকালীন সময় মসজিদে নববী ছোট ছিল। হযরত উসমান (রা.) অনেক উচ্চ মূল্যে উহার সংলগ্ন জমি ক্রয় করেন এবং মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। ওয়াকফকৃত জমির স্থানে রাসূল করীম (স.) তাঁকে বেহেশতের শুভ সংবাদ প্রদান করেন।

যুদ্ধ তহবিলে দান ঃ হযরত উসমান (রা.) ইসলাম পূর্বকাল হতেই ছিলেন অত্যন্ত সম্পদশালী ও বিখ্যাত ব্যবসায়ী। এ প্রাচুর্যের কারণে তাঁকে সকলে গণী (ধনী) নামে ডাকাতো। তিনি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর অর্থ সম্পদকে আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে ব্যয় করতেন। আরবের সকলে তাঁকে দানশীল হিসেবে জানত। তাবুকের যুদ্ধে তিনি দশ হাজার সৈন্যের খরচ বহন করেন। তাছাড়া এক হাজার উট, সত্তরটি ঘোড়া, এক হাজার দীনার রাসুল (স.)-এর দরবারে পেশ করেন। নবী করীম (স.) তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, "আজকের পরে উসমান যদি এ জাতীয় কোন ভাল কাজ নাও করে, তাতে কোন ক্ষতি নেই।"

হযরত উসমান (রা.) -এর চরিত্র

বাল্যকাল হতেই তিনি নম্র। মহানুভবতা ও ন্যায় নিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। সরলতা, কোমলতা, ধৈর্য, ইবনয়, ধর্মভীরুতা, দানশীলতা ও সহনশীলতা তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল।

হযরত উসমান (র) প্রায়ই আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। মৃত্যু, কবর ও পরকালের চিন্তা ছিল তাঁর সব সময়ের সাথী। তিনি জানাযা যেতে দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন আর তখন তাঁর চক্ষু থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অশ্রু নির্গত হতো। কবরের কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাঁড়ি সিক্ত হয়ে যেত। এ সব গুণ ছির তাঁর আল্লাহভীতির জ্বলন্ত প্রমাণ।

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন অত্যন্ত ইবনয়ী, নম্র ও সহজ-সরল প্রকৃতির। আপন গৃহে বহু গোলাম ও বাঁদী থাকা সত্ত্বেও নিজের কাজগুলো নিজের হাতে সম্পাদন করতেন। এজন্য অন্যকে কষ্ট দিতেন না। কেউ কঠোর ব্যবহার করলে বা কটু কথা বললে তিনি কোমল স্বরে তার উত্তর দিতেন।

হযরত উসমান (রা) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে দানশীলও করেছিলেন। নিজের ধন-দৌলত দ্বারা ইসলামকে এমন এক সময় সাহায্য করেছেন যখন ইসলামের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ে মুসলমানদের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ ধনী ছিল না।

হযরত উসমান (রা.) ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। বিপদে-আপদে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতেন। শাহাদাতের পূর্বে পরপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এ অবস্থা দেখে হাজার হাজার সহযোগী ও আনসার প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি ধৈর্য ও পরম সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি হয়ে রক্তপাতের অনুমতি দেন নি। তিনি নিজের মহান চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন দেখিয়ে চির বিদায় নিলেন।

রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ঃ হযরত উসমান (রা.) রাসূল করীম (স.)-কে অত্যধিক সম্মান করতেন। নবী করীম (স.)-এর পরিবারবর্গের ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। নিজের খিলাফতকালে রাসূল (স.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভাতা দ্বিগুণ করে দেন।

হযরত আলী (রা.)

নাম ও বংশ পরিচয় ঃ নাম- আলী, ডাকনাম- আবুল হাসান, আবু তুরাব, উপাধি- হায়দার, পিতার নাম আবু তালেব ও মাতার নাম ফাতেমা।

বংশ পরিচয় ঃ বংশ পরিচয়ের দিক থেকে তিনি আলী ইবনে আবু তালেব ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মান্নাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কায়াব। হযরত আলী (রা.) নিজের চাচাত বোন ফাতিমা ইবনতে মুহাম্মদকে (স) বিবাহ করেছিলেন। তাই হযরত আলী (রা.) পিতৃকুল মাতৃকূল উভয় দিক থেকেই হাশেমী এবং তিনি নবী করীম (স.)-এর চাচাত ভাই।

জন্ম ঃ হযরত আলী (রা.) রাসূলে করীম (স.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে ৬০০ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবু তালিবের মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.) নবী করীম (স.)-এর হাতে লালিত-পালিত হন।

ইসলামে দীক্ষা ঃ হযরত আলী (রা.) বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। বাল্যকালেই লেখাপড়া শিখেন এবং যৌবনে পদার্পণেই অসি চালনা শিক্ষা করেন। তিনি ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষায় বড় আলেম ও যুদ্ধের ময়দানে কটীন যোদ্ধা। তিনি অসি ও মসী উভয়টি দিয়ে আজীবন ইসলামের খেদমত করে গিয়েছেন।

মক্কী জীবন ঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত আলী (রা.) জীবনের তেরটি বছর মক্কায় অতিবাহিতো করেন। দিবা রাত্র রাসূলে করীম (স)-এর সাথে থাকতেন। এজন্য পরামর্শ সভায়, শিক্ষা ও অনুশীলনের মজলিসে, কাফির ও মুশরিকদের সাথে বিতর্ক আলোচনায় এবং ইবাদত বন্দেগীসহ সর্বত্র তিনি শরীক থাকতেন।

হাজ্জের সময় নবী করীম (স.) হযরত আবু বকর ও হযরত আলী (রা.)-কে নিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কখনো কখনো রাসূল (স.)-এর সাথে কাবাগৃহে চলে যেতেন এবং মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরে বিকৃত করে দিতেন।

রাসূল (স.)-এর প্রতি হিজরতের প্রত্যাদেশ হলে নবী করীম (স.) হযরত আলীকে নিজের বিছানায় শায়িত রেখে আবু বকর (রা.) কে নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। রাসূলে করীম (স.)-এর মক্কা ত্যাগের দু'তিন দিন পর পর্যন্ত হযরত আলী মক্কায় অবস্থান করেন, অতঃপর তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে স্বদেশ ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন।

শিক্ষা-দীক্ষা ঃ হযরত আলী (রা.) বড় মাপের শিক্ষিত ও পন্ডিত ছিলেন। রাসূল (স.) বলেছেন, "আমি জ্ঞানের শহর আর আলী (রা.) -এ জ্ঞানের দরজা। তিনি যেমন ছিলেন বড় শিক্ষিত তেমন ছিলেন অসীম সাহসী ও তেজস্বী।"

যুদ্ধে অংশগ্রহণ ঃ হযরত আলী (রা.) ইসলামের প্রায় প্রত্যেকটি যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। নবী করীম (স.) তাঁর বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিজের তলোয়ার যুলফিকার প্রদান করেছিলেন। খায়বর বিজয়ে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি খায়বর যুদ্ধে খায়বরের কামূস দূর্গের দরজা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। হযরত আলী (রা.)-এর এ বীরত্ব চিরদিন ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

বিবাহ ঃ হযরত আলী (রা.) ২৪ বছর বয়সে রাসূল (স.)-এর স্নেহের কন্যা বিবি ফাতিমাকে বিবাহ করেন। তিনি একদিকে রাসূল (স.)-এর জামাতা আর অন্য দিকে চাচাত ভাই। হযরত ফাতিমা (রা.) -এর ঘরে তাঁর তিন ছেলে হাসান, হুসাইন ও মুহসিন এবং দু' মেয়ে যয়নব ও উম্মে কুলসূম জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত আলী (রা.)-এর চরিত্র

হযরত আলী (রা.) ছিলেন অনাড়ম্বর, সরল ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক। মুসলিম জাহানের খলীফা হয়েও স্বহস্তে নিজের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করতেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়বান মুসলমান ছিলেন।

হযরত আলী (রা.) ছিলেন আরবের অন্যতম পন্ডিত ব্যক্তি। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা, সাহিত্যে ও আলংকারিক দিক আরবী সাহিত্যে ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর বিভিন্ন ঐতিহাসিক চিঠিপত্র, কবিতা ইত্যাদি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের আকর্ষণীয় নিদর্শন। তিনি কুরআন, হাদীস, কাব্য, দর্শন ও আইন শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর লিখিত "দীওয়ানে আলী" আজও আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মুসলিম বিশ্বের শিক্ষানুরাগী ও কাব্যানুরাগী সকলের কাছে এ কাব্য গ্রন্থ বহুল পরিচিত ও সমাদৃত। আরবী ব্যাকরণের ভিত্তি হযরত আলী (রা.) -ই স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজের সাথীদের মধ্য থেকে আবুল আসওয়াদ দুয়াইলী নামক জনৈক ব্যক্তিকে একাজে নিয়োগ করেছিলেন।

যুদ্ধে গমন ও আসাদুল্লাহ উপাধি ঃ হযরত আলী (রা.) একজন সাহসী যোদ্ধা ও বীর ছিলেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক, খাইবর ও হুনাইনের যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। রাসূল (স.) তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উওরে টিক দিন

১। হযরত আবু বকর (রা.) -এর উপাধি

ক. সিদ্দীক; খ. সিদ্দীক ও আতীক;

গ. আবু কোহাফা; ঘ. বিশ্বস্ত বন্ধু।

২। বয়স্কদের মাঝে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী

ক. হযরত খাদীজা (রা.); খ. হযরত আবু বকর (রা.);

গ. হযরত হামযা (রা.); ঘ. হযরত আব্বাস (রা.)।

৩। হযরত মুহাম্মদ (স.) হিজরতে সময় সাওর গুহায় কয়দিন অবস্থান করেন?

ক. ৫ দিন; খ. ৩ দিন;

গ. ৭ দিন; ঘ. ১ দিন।

৪। হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন

ক. ২৫ বছর বয়সে; খ. ২৭ বছর বয়সে;

গ. ১৮ বছর বয়সে; ঘ. ৩২ বছর বয়সে।

৫. তৃতীয় খলীফা ছিলেন-

ক. হযরত উমার (রা.); খ. হযরত উসমান (রা.);

গ. হযরত আলী (রা.); ঘ. হযরত আবু বকর (রা.)।

এক কথায় উত্তর দিন

১। খোলাফায়ে রাশেদূনের শাসনামল কয় বছর ছিল ?
২। মদীনায় হিজরতে নবী করীম (স.)-এর সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য কার হয়েছিল ?
৩। যিন্নুরাইন কাকে উপাধি দেয়া হয়েছিল ?
৪। আসাদুল্লাহ কার উপাধি ছিল ?
৫। বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে ইসলাম গ্রহণ করেন ?
৬। খোলাফায়ে রাশেদূনের প্রথম খলীফা কে ছিলেন ?
৭। ফারুক কার উপাধি ছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১। হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২। ইসলামের শক্তি বৃদ্ধিতে হযরত উমর (রা.)-এর অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৩. হযরত উসমান (রা.) কে যিন্‌নূরাইন উপাধি কেন দেয়া হয়েছিল ? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪. হযরত আলী (রা.) -এর চারিত্রিক গুণাবলী সংক্ষেপে লিখুন।

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১। খোলাফায়ে রাশেদূন বলতে কী বুঝায় ? আলোচনা করুন।
২। হযরত আবু বকর (রা.)এর জীবনী আলোচনা করুন।
৩। হযরত উমরের (র) জীবনী আলোচনা করুন।
৪। হযরত উসমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ইসলামে তাঁর অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

পাঠ ঃ ২ খোলাফায়ে রাশেদূন সরকারের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ◆ খোলাফায়ে রাশেদূন সরকার-এর গঠন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে পারবেন;
- ◆ খোলাফায়ে রাশেদূন-এর নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ খোলাফায়ে রাশেদূন সরকার শূরা ভিত্তিক সরকার এ সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ◆ খোলাফায়ে রাশেদূন-এর সরকার পরিচালনা সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ◆ খোলাফায়ে রাশেদূন সরকার একটি নিরপেক্ষ ও গণতান্ি ক এ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত হ'তে শুরু করে হযরত আলী (রা)-এর খিলাফত পর্যন্ত এ সময় কালকে (৬৩২ খ্রীঃ হতে ৬৬১ খ্রীঃ) ইসলামের ইতিহাসে খিলাফতে রাশেদা বলে। আর যাঁরা এ সময় পর্যন্ত মুসলিম জাহানের রাষ্ট্রনেতা ছিলেন তারা হলেন 'খোলাফা রাশেদূন'। নবী করীম (স) এর জীবদ্দশায় ইসলামের যে সকল শাসন নীতি চালু ছিল। তাঁর পরে সেসব মূলনীতির উপর খোলাফা রাশেদূনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (সা) এর প্রত্যক্ষ শিক্ষা-দিক্ষা ও কার্যকর নেতৃত্বের ভিত্তিতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রত্যেক সদস্যই জানতো, ইসলামের বিধি-বিধান ও প্রাণসত্তা অনুযায়ী কোন্ ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। ইসলাম একটি শূরাভিত্তিক সরকার কামনা করে। তাই খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে কোন বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বল প্রয়োগ করে কোন ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি। খেলাফত লাভ করার জন্য কেউ নিজের তরফ থেকে চেষ্টা-তদবীর ও করেনি, কোন প্রকার প্রচেষ্টাও চালায়নি। বরং জনসাধারণ তাদের স্বাধীন মর্জী মতো পর পর চারজন সাহাবীকে তাদের খলীফা মনোনীত করেছে। মুসলিম মিল্লাত এ খেলাফতকে সত্যাশ্রয়ী খেলাফত বলে গ্রহণ করেছে। তাই মুসলমানদের দৃষ্টিতে এটি হচ্ছে খেলাফতের সাত্যিকার পদ্ধতি। নিম্নে খোলাফায়ে রাশেদূন সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হল।

নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন

চার খলীফাই তৎকালীন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের নির্বাচিত হওয়ার প্রক্রিয়া নিম্নরূপ।

হযরত আবু বকর (রা) এর খলীফা নির্বাচন

খলীফা হওয়ার জন্য হযরত উমর (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেন। মদীনার সকলেই কোন প্রকার চাপ-প্রভাব এবং প্রলোভন ব্যতীত সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে গ্রহণ করে নেয় এবং তাঁর হাতে বায়আত করে।

হযরত উমর (রা)-এর খলীফা নির্বাচন

হযরত আবু বকর (রা) তাঁর ওফাতকালে হযরত উমর (রা) কে খলীফার জন্য মনোনীত করেন। অতঃপর জনগণকে মসজিদে নববীতে সমবেত করে বলেন ঃ

"আমি যাকে স্থলাভিষিক্ত করছি তোমরা কি তার উপর সন্তুষ্ট ? আল্লাহর শপথ ! সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগে আমি বিন্দুমাত্র ও ত্রুটি করিনি। আমার কোন আত্মীয়-স্বজনকে নয়, বরং উমর ইবনুল খাত্তাবকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশ মানবে এবং আনুগত্য করবে।" সবাই সমস্বরে বলে উঠে ঃ আমরা তাঁর নির্দেশ শুনবো এবং মানবো। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা) খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন এবং লোকেরা তাঁর হাতে বাইয়াত করেন।

হযরত উসমান (রা) খলীফা নির্বাচন

অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা) তাঁর ওফাতকালে খলীফা নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করে বলেন ঃ 'মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি জোর করে আমীর হওয়ার চেষ্টা করবে, তাকে প্রতিরোধ

করো" খেলাফত যাতে বংশানুক্রমিক পদাধিকারে পরিণত না হয়, সেজন্য তিনি খেলাফত লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে নিজের ছেলের নাম সুস্পষ্টভাবে বাদ দিয়ে দেন। যাদেরকে নিয়ে এ নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয়, হযরত উমরের মতে তারা ছিলেন জাতির মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয়।

কমিটির প্রভাবশালী সদস্য আবদূর রহমান ইবনে আওফকে কমিটি শেষ পর্যন্ত খলীফার নাম প্রস্তাব করার ইখতিয়ার দান করে। সাধারণ লোকদের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে তিনি জানতে চেষ্টা করেন। কে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। পবিত্র হজ্জ শেষ করে সে সব লোক বিভিন্ন এলাকায় ফিরে যাচ্ছিল, তিনি তাদের সাথেও আলোচনা করেন। এ জনমত যাচাইয়ের ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অধিকাংশ লোকই হযরত উসমান (রা) এর পক্ষে। তাই তাঁকেই খেলাফতের জন্য নির্বাচিত করা হয়। সাধারণ জন সমাবেশে তাঁর বায়আত করেন।

হযরত আলী (রা)-এর খলীফা নির্বাচন

হযরত উসমান (রা) এর শাহাদাতের পর কিছু লোক হযরত আলী (রা)-কে খলীফা করতে চাইলে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলেন ঃ 'তোমাদের কার এমন ইখতিয়ার নেই।' এটাতো শূরার সদস্য এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজ। তাঁরা যাঁকে খলীফা করতে চান। তিনিই খলীফা হবেন। আমরা মিলিত হবো এবং এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবো।" ইমাম তাবারী হযরত আলী (রা)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন" "গোপনে আমার বায়আত অনুষ্ঠিত হতে পারে না, তা হতে হবে মুসলমানদের মর্জী অনুযায়ী।"

হযরত আলী (রা) তাঁর ওফাতকালে যখন আপন পুত্রদেরকে শেষ ওসিয়ত করেছিলেন ঠিক সে সময় জনৈক ব্যক্তি আরয করলো, আমীরুল মোমিনীন ! আপনি আপনার উত্তরসূরী মনোনয়ন করছেন না কেন ? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি মুসলমানদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে যেতে চাই, যে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন রাসূল (স)"। (এ ইউনিটের ৩য় পাঠের শুরুতে এ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে সেখানেও দেখা যেতে পারে)।

এসব ঘটনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, খেলাফত সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদূন এবং রাসূল (স)-এর সাহাবীদের সর্বসম্মত মত এই ছিল যে, খোলাফায়ে রাশেদূন সরকারে পদ্ধতি তথা খেলাফত একটা নির্বাচন ভিত্তিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত, মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই তা কায়েম করতে হবে। বংশানুক্রমিক বা বল প্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাঁদের মতে খেলাফত নয় ; বরং তা রাজতন্ত্র। খেলাফত ও রাজতন্ত্রের যে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা সাহাবা কেরাম পোষণ করতেন, হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রা) তা ব্যক্ত করে বলেন-

"এমারত (অর্থাৎ খেলাফত) হচ্ছে তাই যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়ে থাকে, আর তরবারীর জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে রাজতন্ত্র।"

শূরা ভিত্তিক সরকার

খোলাফায়ে রাশেদূন তাঁদের সরকারের কার্যাবলী সমাধান এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে জাতির বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ না করে কোন কিছুই করতেন না। সুনানে দারামীতে মায়মুন ইবনে মিহরান থেকে বর্ণিত। "হযরত আবু বকর (রা)-এর নীতি ছিল, তাঁর সামনে কোন বিষয় উত্থাপিত হলে তিনি প্রথমে দেখতেন এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব কী বলে, সেখানে কোন নির্দেশনা না পেলে এ ধরনের ব্যাপারে রাসূল (সঃ) কী ফয়সালা দিয়েছেন তা জানতে চেষ্টা করতেন। রাসূলে করীম সা. এর সুন্নায়ও কোন নির্দেশ না পেলে জাতির নেতৃত্ব স্থানীয় এবং সৎ ব্যক্তিদের সমবেত করে পরামর্শ করতেন। সকলের পরামর্শক্রমে যে মতই স্থির হতো, তদানুযায়ী ফয়সালা করতেন। হযরত উমর (রা)-এর কর্মনীতিও এরূপ ছিল।

পরামর্শের ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদূন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, শূরার সদস্যদের সম্পূর্ণ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে। এব্যাপারে হযরত উমর (রা) এক পরামর্শ সভার উদ্বোধনী ভাষণে খেলাফতের এরূপ পলিসি ব্যক্ত করেছেন ঃ

"আমি আপনাদেরকে যে জন্য কষ্ট দিয়েছি তা হচ্ছ এই যে, আপনাদের কার্যাবলির যে ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে তা বহন করার কাজে আপনারা ও আমার সঙ্গে শরীক হবেন। আমি আপনাদের মধ্য হতে একজন। আর আপনারাই সত্যের স্বীকৃতি দানকারী। আপনাদের মধ্য থেকে যাদের ইচ্ছা, আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন ; আবার যাদের ইচ্ছা আমার সাথে একমতও হতে পারেন। আপনাদের কে, আমার মতামত সমর্থন করতে হবে- এমন কোন বাধ্য বাধকতা নেই এবং আমি তা চাইও না।"

বায়তুলমালকে আল্লাহ ও জনগণ প্রদত্ত একটি আমানত হিসেবে বিশ্বাস করা

খোলাফায়ে রাশেদূন বায়তুলমালকে আল্লাহ ও জনগণের আমানত মনে করতেন। বেআইনীভাবে বায়তুলমালের মধ্যে কিছু প্রবেশ করা ও বেআইনীভাবে তা থেকে কিছু চলে যাওয়াকে তারা বৈধ মনে করতেন না। শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিগত স্বার্থে বায়তুলমাল ব্যবহার তাঁদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম ছিল। খোলাফায়ে রাশেদূনের প্রত্যেক সরকার বায়তুলমালকে আল্লাহ এবং জনগণের আমানত মনে করে সত্য-ন্যায়-নীতি মোতাবেক এক একটি পাই পয়সা উসূল করতেন। আর তা ব্যয়ও করতেন সত্য-ন্যায়-নীতি অনুসারে। হযরত উমর (রা) একদা হযরত সালমান ফারসীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি রাজা না, খলীফা ? তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দেন ; "মুসলমানদের ভূমি থেকে আপনি যদি এক দেরহামও অন্যায়ভাবে উসূল এবং অন্যায়ভাবে ব্যয় করেন তাহলে আপনি খলীফা নন বরং আপনি রাজা।"

অপর এক প্রসঙ্গে একদা হযরত উমর (রা) স্বীয় মজলিসে বলেন ঃ 'আল্লাহর কসম, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না যে, আমি রাজা, না খলীফা, আমি যদি রাজা হয়ে গিয়ে থাকি, তবে তাতো এক জঘন্য ব্যাপার।"

এতে জনৈক ব্যক্তি বললো ঃ "আমীরুল মুমিনীন ! এতদুভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে"। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন কি পার্থক্য ? তিনি বললেন ঃ খলীফা অন্যায়ভাবে কিছুই গ্রহণ করেন না। অন্যায়ভাবে কিছু ব্যয়ও করেন না। আল্লাহর অনুগ্রহে আপনিও অনুরূপ। আর রাজা তো মানুষের উপর যুলুম করে, অন্যায়ভাবে এক জনের কাছ থেকে উসুল করে ; আর অনায়ভাবে অপরজনকে দান করে"।

বায়তুলমালে খলীফার অধিকার কতটুকু এ প্রসঙ্গে খলীফা উমর (রা) একদা তাঁর এক ভাষণে বলেন ঃ

"গ্রীষ্মকালে এক জোড়া কাপড়, শীতকালে একজোড়া কাপড়। কুরাইশ বংশের একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ অর্থ আপন পরিবার-পরিজনের জন্য, এছাড়া আল্লাহর সম্পদের মধ্যে আর কিছুই আমার জন্য হালাল নয়। আমি তো মুসলমানদের একজন সাধারণ ব্যক্তি বৈ আর কিছুই নই"।

হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত উমর (রা)-এর বেতনের মান যা ছিল হযরত আলী (রা) ও তাঁর বেতনের মান তাই রাখলেন। তিনি পায়ের হাঁটু এবং গোড়ালীর মাঝ বরাবর পর্যন্ত উঁচু তহবন্দ পরতেন। সারা জীবন একটু আরামে কাটাবার সুযোগ হয়নি। একবার জনৈক ব্যক্তি শীতের মওসুমে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। দেখেন, তিনি একখানা সাধারণ কাপড় পরে বসে আছেন। শাহাদাতের পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির হিসাব নিয়ে দেখা গেল মাত্র ৭ শত দিরহাম। তাও তিনি এক পয়সা এক পয়সা করে সঞ্চয় করেছেন একজন ক্রীতদাস খরিদ করার জন্য। আমিরুল মুমিনীন বলে চিনতে পেরে তাঁর কাছ থেকে যাতে কম মূল্যে কেউ গ্রহণ না করে এ ভয়ে কোন পরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে বাজারে কখনো কোন জিনিস কিনতেন না। যখন হযরত মুয়াবিয়ার সাথে তার মতবিরোধ চলছিল, কেউ কেউ তাঁকে পরামর্শ দেন, আপনিও তেমন বায়তুলমালের ভা ার উজাড় করে টাকার বন্যা বইয়ে দিয়ে সমর্থক সংগ্রহ করুন। কিন্তু তিনি এ বলে তা প্রত্যাখ্যান করলেন "তোমরা কি চাও, আমি অন্যায়ভাবে সফল হই"? তাঁর আপন ভাই হযরত আকীল (রা) তাঁর কাছে টাকা দাবী করেন বায়তুলমাল থেকে। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করে বলেন ঃ "তুমি কি চাও তোমার ভাই মুসলমানদের টাকা তোমাকে দিয়ে জাহান্নামে যাক"?

খলীফারা ছিলেন জনসাধারণের সেবক

রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিজেদের মর্যাদা এবং কর্তব্য সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদূন কি ধারণা পোষণ করতেন, স্বীয় রাষ্ট্রে তাঁরা কোন্ কোন্ নীতি মেনে চলতেন ? খেলাফতের মঞ্চ থেকে ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁরা নিজেরাই প্রকাশ্যে এসব বিষয় ব্যক্ত করেছেন। মসজিদে নববীতে গণ বায়আত ও শপথের পর হযরত আবু বকর (রা) যে ভাষণ দান করেন তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

"আমাকে আপনাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। আল্লাহর শপথ, আমি নিজে ইচ্ছা করে এ পদ গ্রহণ করিনি। অন্যের পরিবর্তে আমি নিজে এ পদ লাভের চেষ্টাও করিনি। এজন্য আমি কখনো আল্লাহর নিকট প্রার্থনাও করিনি। মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ এবং আরবদের মধ্যে ধর্ম ত্যাগের সূচনা হবে এ আশংকায় আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এ পদে আমার কোন শান্তি নেই। বরং এটা এক বিরাট বোঝা, যা আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল অন্য কেউ এ গুরু দায়িত্বভার বহন করুক। এখনো আপনারা ইচ্ছা করলে নবী করীম (স)-এর সাহাবীদের মধ্য হতে কাউকে এ কাজের জন্য বাছাই করে নিতে পারেন। আমার বায়আত এ ব্যাপারে আপনাদের প্রতিবন্ধক হবে না। "

রাষ্ট্রীয় সম্পদের আমানত রক্ষা করা

এ প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা) তাঁর এক ভাষণে বলেন-

"হে লোক সকল ! আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য করতে হবে- নিজের সম্পর্কে এমন অধিকারের দাবী কেউ করতে পারে না। লোক সকল ! আমার উপর আপনাদের যে অধিকার রয়েছে, আমি তা ব্যক্ত করেছি। এসব অধিকারের জন্য আপনারা আমাকে পাকড়াও করতে পারবেন। খারাজ বা আল্লাহ প্রদত্ত ফাই (ইবনা যুদ্ধে বা রক্তপাত ছাড়াই যে গণীমতের মাল লব্ধ হয়) থেকে বেআইনীভাবে কোন কিছুই গ্রহণ করবো না এবং এভাবে যে অর্থ আমার হাতে আসে অন্যায়ভাবে তার কোন অংশও আমি ব্যয় করবো না।"

হযরত উমর (রা) শাসনকর্তাদের কোন এলাকায় প্রেরণকালে সম্বোধন করে বলতেন ঃ

"মানুষের দন্ড-মুন্ডের মালিক হওয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে মুহাম্মদ (স)-এর উম্মাতের উপর শাসনকর্তা নিয়োগ করছি না। বরং আমি তোমাদেরকে এ জন্য নিয়োগ করছি যে, তোমরা সালাত কায়েম করবে, মানুষের মধ্যে ইনসাফের ফয়সালা করবে, ন্যায়ের সাথে তাদের অধিকার বন্টন করবে"।

বায়আতের পর হযরত উসমান (রা) প্রথম যে ভাষণ দান করেন তাতে তিনি বলেন-

"শোন ! আমি হলাম আনুগত্যকারী, নতুন পথের উদ্ভাবক নই। জেনে রেখো, আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (স) এর সুন্নাহ মেনে চলার পর আমি তোমাদের নিকট তিনটি বিষয় মেনে চলার অঙ্গীকার করছি।

একঃ আমার খেলাফতের পূর্বে তোমরা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে নীতি নির্ধারণ করেছো, আমি তা মেনে চলবো।

দূইঃ যেসব ব্যাপারে পূর্বে কোন নীতি-পন্থা নির্ধারিত হয়নি, সেসব ব্যাপারে সকলের সাথে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

তিনঃ আইনের দৃষ্টিতে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে না পড়া পর্যন্ত তোমাদের ওপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবো।

হযরত আলী (রা) হযরত কায়েস ইবনে সাদকে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবার কালে মিসরবাসীদের নামে যে ফরমান দান করেন, তাতে তিনি বলেন-

"সাবধান ! আমি আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূল এর সুন্নাহ মুতাবিক আমল করবো। আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী আমি তোমাদের কাজ-কারবার পরিচালনা করবো এবং রাসূল (স)-এর সুন্নাহ কার্যকর করবো। তোমাদর আগোচরে তোমাদের কল্যাণ কামনা করবো।"

এ ছিল রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে খোলাফায়ে রাশেদূন সরকারের কর্তব্য, মর্যাদা, ধারণা ও পদ্ধতি যা তাঁরা অনুসরণ করেছেন এবং নীতি হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

খোলাফায়ে রাশেদূন আইনের উর্দ্ধে নয় এ নীতির প্রতি শ্রদ্ধা

খোলাফায়ে রাশেদূন নিজেরা নিজেদেরকে আইনের উর্ধে মনে করতেন না। বরং আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই নিজেকে এবং দেশের একজন সাধারণ নাগরিককে (সে মুসলমান হোক বা অমুসলিম হউক) সমান মনে করতেন। রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে তাঁরা নিজেরা বিচারপতি (কাযী) নিযুক্ত করলেও খলীফাদের বিরুদ্ধে রায়দানে তারা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন, যেমন তাঁরা স্বাধীন একজন সাধারণ নাগরিকের ব্যাপারে। একদা হযরত উমর (রা) এবং হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) এর মধ্যে কোন এক ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। উভয়ই হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে শালিস নিযুক্ত করেন। বাদী-দিবাদী উভয়ে যায়েদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। যায়েদ (রা) দাঁড়িয়ে হযরত উমর (রা) কে তাঁর আসনে বসাতে চাইলেন ; কিন্তু তিনি উবাই (রা)-এর সাথে বসলেন। অতঃপর হযরত উবাই (রা) তাঁর আর্যী পেশ করলেন, হযরত উমর (রা) অভিযোগ অস্বীকার করলেন। নিয়ম অনুযায়ী যায়েদ (রা) এর উচিত ছিল হযরত উমররের কাছ থেকে কসম আদায় করা। কিন্তু তিনি তা করতে ইতস্তত করলেন। হযরত উমর নিজে কসম খেয়ে মজলিস সমাপ্তির পর বললেন ঃ "যতক্ষণ যায়েদের কাছে একজন সাধারণ মুসলমান এবং উমর সমান না হয়, ততক্ষণ সে বিচারক হতে পারে না।"

এমনি একটি ঘটনা ঘটে জনৈক খৃষ্টানের সাথে হযরত আলী (রা)-এর। কুফার বাজারে হযরত আলী (রা) দেখতে পেলেন, জনৈক খৃষ্টান তাঁর হারানো লৌহবর্ম বিক্রি করছে। আমীরুল মুমিনীন হিসেবে তিনি সে ব্যক্তির নিকট থেকে বর্ম ছিনিয়ে নেননি বরং কাযীর দরবারে ফরিয়াদ করলেন। তিনি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারায় কাযী তাঁর বিরুদ্ধে রায় দান করলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত আলী (রা) এবং জনৈক অমুসলিম বাদী-বিবাদী হিসেবে কাযী শোরাইহ-এর আদালতে উপস্থিত হন। কাযী দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা)-কে অভ্যর্থনা জানান। এতে তিনি (হযরত আলী) বলেন, "এটা তোমার প্রথম বে-ইনসাফী"।

বংশ ও গোত্রের পক্ষপাতহীন শাসন

খোলাফায়ে রাশেদূন যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইসলামের নীতি এবং অনুযায়ী তাঁরা বংশ-গোত্র এবং দেশের পক্ষপাতের উর্ধে উঠে সকল মানুষের সাথে সমান আচরণ করতেন- কারো প্রতি কোন রকম পক্ষপাতিত্ব করা হতো না।

মদীনায় যখন হযরত আবু বকর (রা) এর হাতে বায়আত অনুষ্ঠিত হয়, তখন গোত্রবাদের ভিত্তিতে হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রা) তাঁর খেলাফত স্বীকার করা থেকে বিরত ছিলেন। এমনি করে গোত্রবাদের ভিত্তিতেই আবু সুফিয়ানের নিকট তাঁর খেলাফত ছিল অপসন্দনীয়। তিনি হযরত আলী (রা)-এর নিকট গিয়ে বলেছিলেন ঃ "কুরাইশের সবচেয়ে ছোট গোত্রের লোক কি করে খলীফা হয়ে গেল ? তুমি নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাতে প্রস্তুত হলে আমি তোমাকে সহযোগিতা করব।" কিন্তু হযরত আলী (রা) কড়া জবাব দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করে দেন। তিনি বলেন ঃ তোমার এ কথা ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতা প্রমাণ করে। মুসলমানরা পরস্পরের কল্যাণকামী। তারা একে অপরকে ভালবাসে। অবশ্য মুনাফিক একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী। আমরা আবু বকর (রা)-কে এ পদের যোগ্য মনে করি। তিনি এ পদের যোগ্য না হলে আমরা কখনো তাঁকে এ পদে নিয়োজিত হতে দিতাম না।"

হযরত উমর (রা) জীবনের শেষ অধ্যায়ে আশংকাবোধ করলেন, তাঁর পরে আরবের গোত্রবাদ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং তার ফলে ইসলামের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তাই শেষ সময়ে তিনি হযরত আলী (রাঃ), হযরত উসমান (রা) এবং হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) কে ডেকে বলেন ঃ "আমার পরে তোমরা খলীফা হলে স্ব-স্ব গোত্রের লোকদেরকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেবে না। উপরন্তু ছয় সদস্যের নির্বাচনী শূরার জন্য তিনি হেদায়াত দিয়ে যান।"

গণতন্ত্রের চর্চা

সমালোচনা ও মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতাই এ খেলাফতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। খলীফাগণ সর্বক্ষণ জনগণের নাগালের মধ্যে থাকতেন। তাঁরা নিজেরা শূরার অধিবেশনে বসতেন এবং আলোচনায় অংগ্রহণ করতেন। তাঁদের কোন সরকারী দল ছিল না। তাঁদের বিরুদ্ধেও কোন দলের অস্তিত্ব ছিল না। মুক্ত পরিবেশে সকল সদস্য নিজ নিজ ঈমান এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সামনে সকল বিষয় যথাযথভাবে উপস্থাপন করতেন। কোন কিছুই গোপন করা হতো না। ফায়সালা হতো দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে, কারোর দাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি, স্বার্থ সংরক্ষণ বা দলাদলির ভিত্তিতে নয়। কেবল শূরার মাধ্যমেই খলীফারা জতির সম্মুখে উপস্থিত হতেন না; বরং দৈনিক পাঁচবার সালাতের জামায়াতে, সপ্তাহে একবার জুময়ার জামায়াতে এবং বৎসরে দু'বার ঈদের জামাআতে ও হজ্জ-এর সম্মেলনে তাঁরা জাতির সামনে উপস্থিত হতেন। অন্যদিকে সর্বদা জাতির লোকেরাও তাঁদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেতো। তাঁদের নিবাস ছিল জনগণের মধ্যেই। কোন দারোয়ান ছিল না তাঁদের গৃহে। সকল সময়ে সকলের জন্য তাঁদের দ্বার খোলা থাকতো। তাঁরা হাট-বাজারে জনগণের মধ্যে চলাফেরা করতেন। তাঁদের কোন দেহরক্ষী ছিল না। এ সুযোগে যে কোন ব্যক্তি তাঁদেরকে প্রশ্ন করতে, সমালোচনা করতে ও তাঁদের নিকট থেকে হিসাব চাইতে পারতো। তাঁদের নিকট থেকে কৈফিয়ত তলব করার স্বাধীনতা ছিল সকলেরই। এ স্বাধীনতা ব্যবহারে তাঁরা কেবল অনুমতিই দিতেন না ; বরং এ জন্য লোকদেরকে উৎসাহিতোও করতেন। ইত:পূর্বে বলা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা) তাঁর খেলাফতের প্রথম ভাষণেই প্রকাশ্যে বলে দিয়েছিলেন, "আমি সোজা পথে চললে আমার সাহায্য করবে, বাঁকা পথে চললে আমাকে সোজা করে দেবে।"

একদা হযরত উমর (রা) জুমআর খোতবায় বলেন, "কোন ব্যক্তি যেন বিবাহে চারশ' দেরহামের বেশী মোহর ধার্য না করে। জনৈক্য মহিলা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে বলেন, আপনার এমন নির্দেশ দেয়ার কোন অধিকার নেই। কুরআন স্তুপিকৃত সম্পদ (কেনতার) মোহর হিসেবে দান করার অনুমতি দিচ্ছে। আপনি কে তার সীমা নির্ধারণকারী ? হযরত উমর (রা) তৎক্ষণাৎ তাঁর মত প্রত্যাহার করেন।" একদা তিনি মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমি যদি কোন ব্যাপারে শৈথিল্য দেখাই তাহলে তোমরা কি করবে ?

হযরত বিশর ইবনে সাদ (রা) বললেন, এমন করলে আমরা আপনাকে তীরের মতো সোজা করে দেবো। হযরত উমর (রা) বললেন, তবেই তো তোমরা কাজের মানুষ।"

হযরত উসমান (রা) সবচেয়ে বেশী সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি কখনো জোরপূর্বক মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেন নি; বরং সব সময় অভিযোগ এবং সমালোচনার জবাবে প্রকাশ্যে নিজের কথা বলে গেছেন। হযরত আলী (রা) তাঁর খেলাফত কালে খারেজীদের অত্যন্ত কটু উক্তিকেও শান্ত মনে বরদাশত করেছেন। "একদা পাঁচজন খারেজীকে গ্রেফতার করে তাঁর সামনে হাযির করা হলো। এরা সকলেই প্রকাশ্যে তাঁকে গালি দিচ্ছিলো। তাদের একজন প্রকাশ্যেই বলছিল- আল্লাহর শপথ আমি আলীকে হত্যো করবো। কিন্তু হযরত আলী (রা) এদের সকলকেই ছেড়ে দেন এবং বলেন, কার্যত কোন বিদ্রোহাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিছক মৌখিক বিরোধিতা এমন কোন অপরাধ নয়, যার জন্য তাদেরকে শাস্তি দেয়া যেতে পারে।"

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহই আইন রচনার ভিত্তি

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহই আইন রচনার ভিত্তি ছিল। যে বিষয়ে তাতে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যেত না, সে বিষয়ে ইজতিহাদ (গবেষণা) পদ্ধতিতে রাসূলের আমলের বাস্তব দৃষ্টান্ত ও অনুরূপ ঘটনাবলীর সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এর সমাধান বের করা হতো এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস পারদর্শী প্রতিটি নাগরিকেরই রায় প্রকাশের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল। কোন বিষয়ে সকলের মতৈক্যের সৃষ্টি হলেই সে সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। ফিকাহ-শাস্ত্রের পরিভাষায় একেই বলে 'ইজ্‌মা'। ইসলামী শরীয়াতে এটা সর্বজনমান্য মূলনীতি বিশেষ। আর কোন বিষয়ে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হলে খলীফা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে নিজস্ব রায় প্রকাশ করতেন এবং তদনুযায়ী কার্য সম্পাদন করতেন।

অবাধে মতামত প্রকাশের সুযোগ

খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে রাজকীয় জাঁক-জমক ও শান-শওকাতের কোন স্থান ছিল না। সাধারণ নাগরিকদের ন্যায় অতি সাধারণ ছিল খলীফাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। তাঁরা প্রকাশ্য রাজপথে একাকী চলাফেরা করতেন ; কোন দেহরক্ষী তো দূরের কথা, নামে মাত্র পাহারাদারও কেউ ছিল না। তাদের ঘরবাড়ী ও সাজসরঞ্জাম ছিল সাধারণ পর্যায়ের। জনগণ নিজেদের অভিযোগ ও সমস্যা প্রকাশ করতে পারত। মতামত জানাতে সক্ষম হতো। প্রতিটি মানুষই অবাধে খলীফার নিকট উপস্থিত হতে পারত। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে-

ধর্মীয় নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য করা হতো না

তারা নিজেদেরকে জনগণের খাদেম মনে করতেন। কোন ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজদেরকে সাধারণ লোকদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধারণা করতেন না। তাঁরা কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই জননেতা ছিলেন না, নামায ও হজ্জ প্রভৃতি ধর্মীয় ব্যাপারেও যথারীতি তাঁরাই নেতৃত্ব দিতেন।

খিলাফতে রাশেদার আমলে ধর্মীয় নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হতো না; বরং এ উভয় প্রকার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বই একজন খলীফার ব্যক্তি সত্তায় কেন্দ্রীভূত ও সমন্বিত হয়েছিল। বস্তুতঃ ধর্ম ও রাজনীতির পৃথিকীকরণ এবং ধর্মীয় কাজ ও রাষ্ট্রীয় কাজে দ্বৈতবাদ পরিহার করা হতো। অনুরূপভাবে এতদুভয় একত্রীকরণ ও সর্বতোভাবে একমুখীকরণই ছিল খিলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

সঠিক উত্তরেরে টিক দিন।

১. খোলাফায়ে রাশেদূন সরকার-

ক. আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকার; খ. শূরা ভিত্তিক সরকার;
গ. রাজতন্ত্র ভিত্তিক সরকার; ঘ. গোত্র ভিত্তিক সরকার।

২. খোলাফায়ে রাশেদূনের আইন রচনার মূল ভিত্তি ছিল

ক. কুরআন ও সুন্নাহ খ. ইজমা ও কিয়াস;
গ. সাহাবীদের ঐক্যমত; ঘ. সব কটি উত্তরই ঠিক।

৩. সিরিয়া ও ফিলিস্তিন যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন-

ক. হযরত উমর (রা) খ. হযরত আবু বকর (রা)
গ. হযরত উসমান (রা) ঘ. হযরত আলী (রা)

৪. কুফার বাজারে বিক্রির লৌহবর্মের প্রকৃত মালিক কে?

ক. জনৈক ইয়াহূদী; খ. জনৈক খ্রিষ্টান;
গ. জনৈক মুসলমান; ঘ. কোনটি সঠিক নয়।

এক কথায় উত্তর দিন

১. কিসের ভিত্তিতে হযরত আবু বকর (র) খলীফা নির্বাচিত হন?
২. ইসলামী শরীআতের মূলনীতি কয়টি?
৩. ''আল্লাহর শপথ আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না যে, আমি রাজা না খলীফা, আমি যদি রাজা হয়ে থাকি, তবে তা এক সাংঘাতিক কথা'' এ উক্তিটি কার?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত উমরের খলীফা নির্বাচন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. ''ইসলাম গণতন্ত্রের প্রাণ শক্তি'' এ উক্তিটির সংক্ষেপে ব্যাখ্যা দিন।
৩. ইসলাম একটি শূরা ভিত্তিক সরকার সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪. ইসলামী সরকার ব্যবস্থায় অবাধে মত প্রকাশের সুযোগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৫. খলীফা উসমানের কৃত অঙ্গীকারগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. খোলাফায়ে রাশেদূন সরকারের বৈশিষ্ট্য বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৩ খোলাফায়ে রাশেদূন সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো ও বিচার বিভাগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যায়ন করে আপনি—

- খোলাফায়ে রাশেদূনর সরকার কাঠামো সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- খোলাফায়ে রাশেদূনের বিচার ব্যবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে খোলাফায়ে রাশেদূন সরকার পদ্ধতি একটি যুগান্তকারী শাসন কাঠামো। তবে খোলাফা রাশেদূনের মধ্যে হযরত আবু বকর রা. প্রশাসনিক উন্নতি বিধানে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন নি। কারণ, বিদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তাঁর শাসনকালের সমাপ্তি ঘটে। হযরত উমরই (রা) ছিলেন প্রকৃত পক্ষে ইসলামী সরকার পদ্ধতি সংস্কারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। নিম্নে খোলাফায়ে রাশেদূন সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

খোলাফায়ে রাশেদূন বিশেষ করে হযরত উমর (রা) প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সমগ্র আরব সামাজ্যকে ৮টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। সেগুলো হচ্ছে মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, আল-জাযীরা, বসরা, কুফা, মিসর ও জেরুসালেম। রোমান শাসনামলে জেরুসালেম ১০টি জেলায় বিভক্ত ছিল। খলীফা উমর জেরুসালেমকে প্রধান ২টি বৃহৎ অঞ্চলে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য পৃথক পৃথক ওয়ালী বা প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাদের রাজধানী ছিল আইলা ও রামলা। মিসরকে তিনি উচ্চ মিসর (Upper Egypt) এবং নিম্ন মিসর (Lower Egypt) এ দু'টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। উচ্চ মিসরকে সা'ঈদ' বলা হতো। ইবনে আবি-সারহ্, এর গভর্নর ছিলেন। উক্ত প্রদেশে মোট ২৮টি জেলা ছিল। নিম্ন মিসরের গভর্নর ছিলেন আমর ইবনুল 'আস। উক্ত প্রদেশ ১৫টি জেলায় বিভক্ত ছিল। সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যকে একটি একক অঞ্চল ধরে প্রশাসনিক কার্য চালান হতো। কিন্তু প্রশাসনিক সুবিধার জন্য পারস্যে সাসানী আমলের ৬টি প্রদেশ হুবহু রেখে দেয়া হয়।

খোলাফায়ে রাশেদূনের শাসনকালে খিলাফাতের শাসন কাঠামো একটি নবরূপ লাভ করে। প্রদেশিক শাসন ব্যবস্থাও একটি নির্দিষ্ট রূপরেখার আওতায় পরিচালিত হয়। খোলাফায় রাশেদূনের আমলে প্রত্যেক প্রদেশের রাজধানীতে একটি স্থায়ী সরকারী অফিস ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ওয়ালীর একটি করে দীওয়ান বা সেক্রেটারীয়েট (Secretariat) স্থায়ীভাবে স্থাপিত হয়। খলীফা উমর (রা) যখন 'আম্মারকে কুফার ওয়ালী হিসেবে প্রেরণ করেন তখন তাঁর সাথে দশজন বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত কর্মচারীও প্রেরণ করেন। প্রদেশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ওয়ালী বা গভর্নর, আমিল বা জেলা প্রশাসক, কাযী বা বিচারক, কাতিব আল-দীওয়ান বা সচিব এবং সাহিব বায়তুলমাল বা কোষাধ্যক্ষ।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি প্রদেশ আবার কতগুলো জেলায় বিভক্ত ছিল। জেলা প্রশাসককে আল-আমিল বলা হতো। বড় বড় জেলাকে কতগুলো অঞ্চলে (sub-divisions) বিভক্ত করা হয় এবং উক্ত অঞ্চলে পৃথক আমিল নিযুক্ত করা হয়। জেলায় জেলায় বিচারের জন্য কাযী নিযুক্ত করা হতো। জেলা বা আঞ্চলিক শাসকগণ ওয়ালীর অধীনে ছিলেন।

খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে ওয়ালী কিংবা আমিল ইত্যাদি কর্মচারীর নিযুক্তির সময় তাঁর সম্পত্তির হিসেব নেয়া হতো। অতঃপর তাঁকে নিয়োগপত্র প্রদান করা হতো। নিয়োগপত্রে উক্ত কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ক্ষমতার পরিধি উল্লেখ থাকত। খলীফার স্বাক্ষর ও সীলমোহরকৃত উক্ত নিযুক্তি পত্রে কয়েকজন গণ্যমান্য আনসার ও মুহাজির ব্যক্তি স্বাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করতেন এবং মসজিদে সাধারণ নাগরিকদের সম্মুখে উক্ত নিয়োগনামা পাঠ করে শোনান হতো। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, খলীফা উমর (রা) ওয়ালীদের নিম্নলিখিতভাবে পরামর্শ দিতেন ঃ

"আপনারা জেনে রাখুন যে, আমি আপনাদেরকে শাসক বা রাজা হিসেবে প্রেরণ করছি না। আমি আপনাদেরকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি। জনসাধারণ আপনাদের অনুসরণ করবে। ভাল লোকদের উপর বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করবেন। তাদেরকে এমন আঘাত দিবেন না যাতে তারা অপমানিত হয় বা তাদের এমন

প্রশংসাও করবেন না যাতে তারা শৃংখলা ভঙ্গ করে। আপনার দরজা জনসাধারণের জন্য মুক্ত রাখবেন। তা না হলে সবলরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার করবে।"

বেতন ভাতা

প্রশাসকগণ সকলেই নিয়মিত বেতনসহ রেশন পেত। বেতনের পরিমাণও ছিল উচ্চ। আম্মার ইবন ইয়াসির বার্ষিক ৬০০ দিরহাম এবং দৈনিক রেশন পেতেন। কর্মচারীদের কার্যকলাপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। অবৈধ উপায়ে ধন সংগ্রহ বা সঞ্চয়ের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। দুর্নীতির অভিযোগে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো।

বিচার বিভাগ

খোলাফায়ে রাশেদূন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং নিরপেক্ষ রাখার দিক দিয়ে সকল যুগের উপর শ্রেষ্টত্ব লাভ করেন। তাঁরা নিরপেক্ষ বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগকে উৎসাহ প্রদান করেন। খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে বিচার বিভাগ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিচারে শুনানী ও রায়দানের বিধি বিধান সুষ্ঠু নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বিচারের গুরু দায়িত্ব যে ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হতো তাকে কাযী বলা হতো। কেন্দ্রে খলীফা স্বয়ং প্রধান কাযীর দায়িত্ব পালন করতেন। প্রাদেশিক কাযী এবং জেলা-কাযী নিযুক্ত হতেন। কাযীগণ প্রাদেশিক গভর্নর বা জেলা প্রশাসকের অধীন ছিলেন না বরং তাঁরা ছিলেন পূর্ণ স্বাধীন। কাযীদেরকে খলীফা স্বয়ং নিযুক্ত করতেন। কখনও বা খলীফার আদেশে প্রাদেশিক গভর্নরগণ ন্যায়বান ব্যক্তিকে কাযী হিসেবে নিযুক্ত করতেন। খলীফা উমর (র) আবু মুসা আল-আশ'য়ারীকে (র) জনগণ কর্তৃক সম্মানিত ব্যক্তিকে কাযী নিয়োগ প্রদান করতে আদেশ প্রদান করেন। কাযীগণ উচ্চ নীচ ভেদাভেদ না করে বিচারের রায় প্রদান করতেন। এমনকি হযরত আলী (রা) ও একবার কাযীর বিচারে হেরে যান।

কাযীদের আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও গুণাবলী

নিযুক্তির সময় কাযীর যোগ্যতা চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা করে দেখা হতো। কাযীকে যে সব অপরিহার্য গুণের অধিকারী হতে হতো সেগুলো হচ্ছে

- তাঁকে পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে সুপন্ডিত হতে হতো।
- তাঁকে হাদীসশাস্ত্রে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হতে হতো।
- তাঁকে সাহাবীদের পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী হতে হতো।
- তাঁকে পূর্ণ বয়স্ক, পুরুষ, মুসলমান, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন, স্বাধীন, সচ্চরিত্র, দৃষ্টিশক্তি ও পূর্ণ শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হতে হতো।

কাযীগণ এমন চারিত্রিক মাধুর্য ও উন্নত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন যে, খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে কোন কাযীর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ বা পক্ষপাতমুলক বিচারের অভিযোগ উত্থাপিত হয় নি। খোলাফায়ে রাশেদূন সরকার কাযীদেরকে উপযুক্ত বেতন প্রদান করতেন।

কাযীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

কাযীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা নিষ্পত্তি করা, অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা, ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা, অছিয়ত কার্যকর করা, বিধবা বিবাহ উৎসাহিতো ও বন্দোবস্ত করা, অপরাধিদের নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করা, অনধিকার দখল উচ্ছেদ করা, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্থদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং তাদের আচরণের উপর লক্ষ্য রাখা। দুর্বলকে সবলদের অত্যাচার ও অন্যায় থেকে রক্ষা করা।

বিচারের সময় কাযীদের করণীয়

খোলাফায়ে রাশেদূন সরকার আমলে কাযীদের করণীয় ছিল নিম্নরূপ ঃ

- বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষকে সমভাবে গ্রহণ করা,
- বাদী ও বিবাদী উভয়কেই প্রমাণ উপস্থাপন করার সুযোগ দেয়া,
- সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে বাদী ও বিবাদী উভয়কেই প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ করানো,

- যে কোন অবস্থায় বাদী ও বিবাদীর মধ্যে কাযীর মামলা নিস্পত্তি করা,
- বিচারক কর্তৃক স্বেচ্ছায় ইচ্ছায় নিজ রায় পুনর্বিবেচনা করা,
- বিচারের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা,
- বিবাদীর অনুপস্থিতিতে এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা,
- যে সব মুসলমান কোন বিচারে শাস্তিপ্রাপ্ত হন নি বা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেন নি শুধু তাদেরকেই সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত করা।

তখন বিচারালয় হিসেবে মসজিদকে ব্যবহার করা হতো। বিচারের দিন উভয় পক্ষ স্ব স্ব লোক নিয়ে বিচারালয়ে উপস্থিত হতো। সাধারণ লোকেরা দর্শক হিসেবে বিচার শ্রবণ করতে উপস্থিত হতো।

বাদী ও বিবাদীকে আইন সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদানের জন্য খলীফাগণ সরকারীভাবে কতিপয় আইন বিশেষজ্ঞ (মুফতি) নিযুক্ত করতেন। কাযীগণও আইনের জটিল সমস্যা সম্বন্ধে মুফতিদের নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারতেন। পরামর্শ প্রদানের জন্য মুফতিগণ কোন ফি গ্রহণ করতে পারতেন না।

খোলাফায়ে রাশেদূনের মধ্যে হযরত উমর (রা) বিচারের জন্য কাযীকে বিশেষভাবে স্বাধীনতা প্রদান করেন। বিখ্যাত কাযী শুরাইহ্কে প্রথমতঃ পবিত্র কুরআনের বিধি অনুসারে বিচারের পরামর্শ দেন। দ্বিতীয়তঃ হাদীসের উপর নির্ভর করে বিচারের রায় প্রদানের জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। হাদীসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত না পাওয়া গেলে ইজমা'র আদর্শ অনুসরণ করতে তিনি আদেশ দেন। ইজমা' দ্বারা অনুরূপ ব্যাপারে নিস্পত্তির দৃষ্টান্ত না থাকলে তিনি শুরাইহকে নিজ মত প্রয়োগ করার অধিকার প্রদান করেন। জটিল ব্যাপারগুলো নিস্পত্তি করার জন্য তিনি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে আদেশ প্রদান করেন।

খলীফা উমর দোষীকে কারারুদ্ধ করার জন্য সর্ব প্রথম কারাগারের ব্যবস্থা করেন। তিনি সাফাওয়ান ইবন উমাইয়ার গৃহ ক্রয় করে মক্কায় কারাগার প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতেও কারাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি নির্বাসন দন্ড প্রদানের রীতিরও প্রচলন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরে টিক দিন

১. ইসলামী সরকার পদ্ধতি সংস্কারের প্রকৃত দৃষ্টান্ত কে ছিলেন?
ক. হযরত আলী (র); খ. হযরত উমর (র);
গ. হযরত উমর ইবন আব্দুল আযীয (র); ঘ. হযরত উসমান (র)।

২. কোন আমলে খিলাফতের শাসন কাঠামো নবরূপ লাভ করে-
ক. উমাইয়া আমলে; খ. আব্বাসীয় আমলে;
গ. খোলাফা রাশেদূনের আমলে; ঘ. কোনটিই ঠিক নয়।

৩. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে প্রদেশের সর্বোচচ পদে যিনি থাকতেন তিনি হলেন-
ক. আমিল; খ. খলীফা;
গ. ওয়ালী; ঘ. কাযী।

৪. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়ার সময় কী করা হতো?
ক. ব্যক্তিগত সম্পত্তির হিসেবে নেওয়া হতো; খ. সন্তান সন্ততির হিসেবে নেওয়া হতো;
গ. নিয়োগ পত্রে তার দায়িত্ব উল্লেখ করা হতো; ঘ. ক ও গ উভয় উত্তরই সঠিক।

৫. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে কেন্দ্রে প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন?
ক. গভর্নর; খ. আমিল;
গ. অন্য কেউ; ঘ. খলীফা নিজেই।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. খোলাফায়ে রাশেদূন-এর শাসন আমল খিলাফতের শাসন কাঠামো একটি নবরূপ লাভ করে- ব্যাখ্যা করুন।
২. খলীফা উমর (র) ওয়ালীদের (গভর্নরদের) নিয়োগ দিয়ে প্রেরণ কালে কি পরামর্শ দিতেন তা লিখুন।
৩. খোলাফায়ে রাশেদূন আমলে কাযীদের কি কি জরূরি যোগ্যতা ও গুণাবলী থাকতে হতো আলোচনা করুন।
৪. খোলাফায়ে রাশেদূন সরকারের আমলে কাযীদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয় কি ছিল বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. খোলাফায়ে রাশেদূন সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
২. খোলাফায়ে রাশেদূন সরকারের আমলে বিচার বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

পাঠ ঃ ৪ খোলাফায়ে রাশেদূনের নির্বাচন প্রক্রিয়া ও মজলিসে শূরা

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- চার খলীফার নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- বাইয়াত কি তা বর্ণনা করতে পারবেন-
- খোলাফায়ে রাশেদূন সরকারের আমলে মজলিশে শূরা পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

নির্বাচন প্রক্রিয়া

নবী করীম সা. এর ইন্তেকালের পর মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বদানের দায়িত্বভার এসে পড়ে খোলাফায়ে রাশেদূনের ওপর। তাঁরা দু'ভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

প্রথমতঃ জাতির গণ্যমান্য গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গ পস্পর আলোচনার মাধ্যমে একমত হয়ে একজন যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিকে খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করতেন।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী খলীফা দ্বারা মনোনিত হয়ে পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত হতেন। যে নির্বাচক মন্ডলী খলীফা নির্বাচন করতেন তাঁদের আহলুল ইমামাহ, আহলুল ইখতিয়ার অথবা আহলুল হাল্ল ওয়া আল-আকদে বলা হতো। তারা ছিলেন সমাজের গণ্যমান্য ন্যয়নিষ্ঠ যোগ্য ও জনপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁদের সিদ্ধান্ত সর্বসাধারণ ইবনা বাক্যে মেনে নিতেন। তাঁরা নবী করীম (স)-এর সহচর ছিলেন। ইসলামী আইন সম্বন্ধে তাঁদের গভীর জ্ঞান ও পান্ডিত্ব ছিল।

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর মাত্র একজন নির্বাচক দ্বারা খলীফা নিযুক্ত হন। আর তিনি ছিলেন হযরত উমর (রা)। পরবর্তীতে সর্বসাধারণ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে হযরত আবু বকর হযরত উমরকে খলীফা মনোনীত করে যান এবং তিনি খলীফা নির্বাচিত হন। অতঃপর জনসাধারণ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। হযরত উমর (র) মৃত্যুকালে ছয়জন নির্বাচক মন্ডলীর উপর খলীফা নির্বাচনের ভার দিয়ে যান। তাঁরা হলেন হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম, সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস ও আবদুর রাহমান ইবন আউফ (র)। তাঁরা আলোচনা করে হযরত উসমানকে খলীফা পদে নির্বাচনের ব্যাপারে একমত হন। হযরত আলীর (রা) খলীফা নির্বাচন ছিল ভিন্ন ধরনের। যে প্রতিনিধিদল হযরত উসমানকে হত্যোর জন্য দায়ী ছিলো তারাই হযরত উসমানকে হত্যোর পর হযরত আলীকে খলীফা পদে নিযুক্ত করে তাঁর হাতে হাত দিয়ে শপথ গ্রহণ করে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই কারণে পূর্ববর্তী খলীফাগণ যেরূপ গণ-অভিনন্দন লাভ করেন সেরূপ গনঅভিনন্দন তিনি লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু এই চার খলীফার মধ্যে কেউ বংশীয় স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হননি। এমনকি উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করতে অনুরোধ করা হলে তাঁরা তা অস্বীকার করেন।

বাইয়াতঃ খিলাফতের সঙ্গে শপথ গ্রহণ এবং বাইয়াত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। বাইয়াত গ্রহণ ছাড়া কারো খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হতো না। নির্বাচক মন্ডলী আনুষ্ঠানিকভাবে বাইয়াত অনুষ্ঠান সমাপ্ত করার পর তা কেউ আর প্রত্যাহার করতে পারতেন না। শপথ গ্রহণ বা বাইয়াত দু' প্রকার। বাইয়াত আল-খাস বা বিশেষ শপথ যা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সম্পন্ন হতো। বাইয়াত আল-আম অর্থাৎ সর্বসাধারণ খলীফার হাতে বাইয়াত করে তাঁকে মেনে নিতেন, আর এভাবে ইসলামী গণতন্ে র যাত্রা শুরু হয়।

মজলিস শূরা পদ্ধতি

নবী করীম (স.) কর্তৃক মদীনায় কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের পর গোত্রীয় পরিষদ বা মজলিসের গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস-পায়। ফলে তা স্থানীয় এবং গোত্রীয় বিষয়াদির ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকে তাঁর আমলে বিশেষ সভা ও সাধারণ সভার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নবী কারীম (স.) মক্কার সাবেক প্রথা কুরআনের (১৩ঃ৩৮) আয়াতের প্রেক্ষিতে গণ্যমান্য মুহাজির ও আনসার নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পন্ন করতেন। রাষ্ট্র বা জাতীয় জীবন যখন জীবনমরণ সমস্যার সম্মুখীন হতো তখন তিনি সাধারণ সভা আহ্বান করতেন।

মহানবী স্বাধীনতা প্রিয় আরবদের সাথে প্রচলিত রীতি অনুসারে আলোচনা না করে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। প্রয়োজন বোধে তিনি কখনোও কতিপয় বিশেষ ব্যক্তির সাথে এবং কখনও সমস্ত নাগরিকের সাথে আলোচনা করে রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলী সমাধান করতেন।

খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর আমল ঃ মহানবীর (স) ইন্তিকালের পর খোলাফায়ে রাশেদূন আমলে শূরার ক্রমোন্নতি অব্যাহতো থাকে। খলীফা আবু বকর (রা) মহানবীর আদর্শের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। তিনি প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজে মহানবীর আদর্শ মেনে চলতেন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শূরার পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

মহানবী শেষ জীবনে যায়েদ ইবন হারিছা নামক এক মুক্তিপ্রাপ্ত দাসকে সেনাপতি নিযুক্ত করে মুতা অভিযানে প্রেরণ করেন। যায়েদের মৃত্যুর পর তার যুবক পুত্র উসামাকে তিনি উক্ত যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। আবু বকর ও উমরের মত প্রবীন সাহাবীগণও তাঁর সহগামী হতে আদিষ্ট হন। উক্ত সেনাবাহিনী মদীনা ত্যাগের পূর্বেই মহানবী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরলোক গমন করেন। সে কারণে উক্ত অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হয়ে উসামাকে মুতা গমনের নির্দেশ প্রদান করেন। সে সময় রিদ্দা-বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ও বিদ্রোহীরা যাকাত প্রদানে অস্বীকার করেছিল। সে সংকটজনক মুহূর্তে গণ্যমান্য সাহাবীদের মতামত নিয়ে উমর (রা) খলীফাকে মুতায় অভিযান প্রেরণ না করতে পরামর্শ দেন।। আর যদি অভিযান একান্তই প্রেরণ করতে হয় তাহলে একজন অভিজ্ঞ সেনানায়কের নেতৃত্বে প্রেরণের জন্যও পরামর্শ দেন। খলীফা আবু বকর (রা) উক্ত প্রস্তাব অস্বীকার করেন এবং তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "যদি একপাল হিংস্র সিংহ মদীনা ঘিরে ফেলে এবং আমি পরিত্যক্ত হই এবং একাকী থাকি তবুও অভিযান প্রেরিত হবেই। কারণ তা মহানবী কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল।" উমর (রা) খলীফাকে বিদ্রোহীদের যাকাত সাময়িকভাবে মাফ করে দিবারও প্রস্তাব দেন। এ প্রস্তাবে খলীফা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন এবং যাকাত মাফ করতে অস্বীকার করেন।

খলীফা হযরত উমর (রা)-এর আমল ঃ খলীফা উমর (রা) জোর দিয়ে ঘোষণা করেন, আলোচনা ছাড়া কোন সরকারী কার্য চলতে পারে না। বস্তুতঃ তাঁর শাসনকালে শূরা গুরুত্বপূর্ণ রূপ লাভ করে। জানা যায় তাঁর আমলে সাধারণ সভা দু'বার আহুত হতো। কাদেসীয়ার যুদ্ধের পূর্বে তিনি স্বয়ং নিজেই সৈন্য পরিচালনা করে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করবেন কিনা সে বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য সাধারণ সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভা খলীফাকে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করার পক্ষে রায় প্রদান করায় তিনি হযরত আলীকে খিলাফতের ভার দিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। কিন্তু মদীনার তিন মাইল দূরে সিরার নামক জলাশয়ের নিকট আহল আল-রা'য় বা শূরার প্রতিনিধিদের আহ্বান করে উক্ত বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ চান। আহলুর রা'য় এর অধিকাংশ সদস্য তাঁকে মদীনায় অবস্থান করে অন্য কোন সাহাবীকে সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের পরামর্শ দেন। অতঃপর তিনি পুনরায় সাধারণ সভা আহ্বান করে সবাইকে জানান যে, যাঁরা সৎ পরামর্শ দেন তাদেরকে মান্য করা কর্তব্য। তিনি ঘোষণা করেন, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের জন্য সকল ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তাঁর রাজধানীতে অবস্থান করে কোন সাহাবীকে সেনাপতিত্ব প্রদান করা মঙ্গলজনক হবে। কেননা স্বয়ং খলীফার পরাজয় হলে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে পড়তে পারে। বরং তিনি মদীনায় অবস্থান করে সৈন্য সংগ্রহ করে পরপর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করলে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে। সকলেই তাঁর যুক্তি অনুধাবন করে তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেন। তিনি সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাসকে সেনাপতি হিসেবে কাদেসিয়ায় প্রেরণ করেন এবং তিনি মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের পর উক্ত অঞ্চলের কৃষিভূমি সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দিবেন, না তার পূর্বতন মালিকদের হাতেই রাখবেন এ বিষয়ের মীমাংসা করার জন্য তিনি দ্বিতীয়বার সাধারণ সভা আহবান করেন। খলীফা উমর ভূমির মূল মালিকদের বঞ্চিত করার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি দু'টি কারণে সাবেক অধিবাসীদের মধ্যে ভূমি বন্টনের পক্ষপাতি ছিলেন।

প্রথমতঃ তিনি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তহবিল জমা করা প্রশাসনিক কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনী নিয়মিত করার জন্য রাষ্ট্রের নিয়মিত আয়ের পক্ষপাতি ছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে উক্ত সম্পত্তি বন্টন করে দিলে রাষ্ট্র খারাজ তথা কর হতে বঞ্চিত হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ভূমি কেড়ে নিয়ে আরবদের মধ্যে বন্টন করার অর্থ তাদেরকে অভাবের মধ্যে ঠেলে দেওয়া। আর তা রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক নয়। এ ব্যাপারে তাঁর আরও একটি মহান উদ্দেশ্য ছিল

বলে জানা যায়। তিনি আরবদের বিশুদ্ধ সামরিক জাতি হিসেবে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। কৃষিভূমি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিলে তারা আরামপ্রিয় হয়ে পড়ত যা নিঃসন্দেহে জাতির জন্য ক্ষতিকর হতো।

মহানবীর আমলে বিজিত অঞ্চলের ভূমির ব্যাপারে দু' প্রকারের নীতি গ্রহণ করা হয়। বানু নায়ির ও বানু-কুরায়যা গোত্রের যাবতীয় ভূসম্পত্তি তিনি বিজয়ী সেনাবাহিনীর মধ্যে বন্টন করে দেন। আবার খায়বারের সামান্য সম্পত্তি নিজ হাতে রেখে অবশিষ্ট সমুদয় ভূমি তিনি খারাজের বিনিময়ে সাবেক ইহূদী কৃষকদেরকেই প্রদান করেন। এ দু'টি প্রতিষ্ঠিত উদাহরণ সম্মুখে থাকা স্বত্ত্বেও খলীফা উমর 'সাধারণ সভা' আহ্বান করেন। সিরিয়া ও ইরাকের ভূমি ভবিষ্যৎ বংশধরের স্বার্থে সাবেক প্রজার হাতেই রাখা হবে কিনা এ বিষয়ে কয়েকদিন ধরে আলোচনা চলে। হযরত আলী, হযরত উসমান, তালহা প্রভৃতি সাহাবাগণ খলীফা উমরের মতামত সমর্থন করেন। কিন্তু আব্দুর রহমান ইবন আউফ ও যুবায়ের (রা)-সহ কিছু সংখ্যক সেনানায়নক উক্ত ভূমি সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার পক্ষে রায় দেন। তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, উক্ত সম্পত্তিতে জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরের কোন অধিকার নেই। খলীফা তখন পবিত্র কুরআনের সূরা আল-হাশর হতে আয়াত উদ্ধৃত করে ঘোষণা করেন, "আল্লাহ তা'য়ালা মহানবীর উপর যা অনুদান হিসেবে অর্পণ করেন তার মালিক যথাক্রমে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর আত্মীয়স্বজন, এতিম, দরিদ্র এবং মুসাফিরগণ। তা ছাড়া মুহাজির, আনসার এবং যারা পরে হিজরত করেছে তারাও উক্ত সম্পত্তির অধিকারী।" (সূরা হাশর-৭)

তিনি যুক্তি দিয়ে সকলকে বুঝাতে সমর্থ হন যে, ফাই-এ পরবর্তী বংশধরদের হক আছে। তাঁর যুক্তি সকলে গ্রহণ করে নেন এবং বিজিত অঞ্চলের ভূমি সাবেক প্রজার মধ্যে রেখে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

খলীফা হযরত উসমান (রা)-এর আমল ঃ খলীফা উসমান (রা)-এর শাসনকালে শূরার গুরুত্ব কমে যায়। কারণ তাঁর আমলে দলগত রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করে। উমাইয়া এবং মাখয ম পরিবারের সদস্যবর্গ বিত্তশালী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠে এবং রাজনীতিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। আম্মার, বিলাল, আবুযর গিফারী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সাহাবীগণও অবহেলিত হতে থাকেন। তা ছাড়া খলীফা উসমানের (রা) উদারতার জন্য হযরত উমরের আমলে যে পরামর্শ সভা ছিল তা ইবনষ্ট হয়ে যায়। তদস্থলে হযরত উসমানের আত্মীয়-স্বজন তাঁর পরামর্শ সভার সদস্য পদ লাভ করেন।

খলীফা হযরত আলী (রা)-এর আমলঃ হযরত আলী (র)-এর শাসনকাল পর্যন্ত অধিকাংশ সাহাবীই পরলোকগমন করেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি প্রথম হতেই গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হন। সে কারণে তাঁর আমলেও পরামর্শ সভার ভূমিকা সীমিত হয়ে পড়ে।

খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগে শূরার সদস্যদের নির্বাচনের জন্য কোন নিয়ম-কানুন প্রণীত হয় নি। জ্ঞান ও গুণের দিক দিয়ে খলীফা যাঁদেরকে যোগ্য মনে করতেন কেবল তাঁদেরকে ডেকেই পরামর্শ করতেন। তবে তাঁর উপদেষ্টাগণ সমগ্র জনসাধারণ কর্তৃক সমাদৃত ছিলেন।

খলীফা উমর (রা) পরামর্শ ব্যতিরেকে রাজকার্য চালাতেন না। তাঁকে দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কাজে যে সব সদস্য পরামর্শ প্রদান করতেন তাঁরা হলেন আবদুর রহমান ইবন আউফ, তালহা, যুবায়ের, হযরত আলী (রা) প্রমুখ ব্যক্তিগণ। খলীফা উমরের শাসনকালে এ সব ব্যক্তি ছিলেন সর্বজনমান্য। কোন নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে তাদেরকে মনোনয়ন করা হয় নি বরং তাদের ধর্মভীরুতা, সামাজিক প্রভাব, ইসলামের স্বার্থে সেবা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সামরিক কৃতিত্বের বিচারেই তাঁদেরকে মনোনয়ন করা হয়। সব দিক দিয়ে তাঁরা সবার নিকট গ্রহণযোগ্য ছিলেন। ভোট দ্বারা নির্বাচিত না হলেও উমর (রা) শূরার সদস্যগণের সিদ্ধান্তকে সাধারণভাবে গণরায় হিসেবেই ধরে নিতেন। মহানবী (স) যে সব ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ করতেন তাঁরা হলেন আবু বকর, উমর, মিকদাদ ইবন আমর, সা'দ ইবন মুয়ায, হুবাব ইবন আল-মুনযির, সালমান ফারসী প্রভৃতি সাহাবী (রা)।

খোলাফায়ে রাশেদূন জটিল জাতীয় সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাধারণ সভা আহ্বান করতেন। এ সভা আহ্বানের নিমিত্ত খলীফা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আহ্বায়ক 'আসসালাতু লিল-জামায়াহ, (নামাযের জন্য সমবেত হও) ধ্বনি দ্বারা নগরির মধ্যে ঘোষণা প্রচার করতেন। রাজধানীর লোকেরা সমবেত হলে জামাতে' দু'রাকআত নামায'' পড়ে সভার কার্য আরম্ভ হতো। উক্ত সভায় অংশ গ্রহণকারী সবার মতামতের উপর গুরুত্ব দেয়া হতো। আনসার, মুহাজির, মদীনায় অবস্থানকারী বেদুঈন, গোত্রপ্রধানগণ সবাই উক্ত সভায় যোগদান করে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারতেন। সভা সাধারণতঃ মদীনা মসজিদের সামনে মিলিত হতো। ছোটখাট বিষয়গুলো একদিনের আলোচনা দ্বারা সমাপ্ত হতো। কিন্তু জটিল সমস্যাগুলো নিয়ে কয়েকদিন

ধরে আলোচনা চলত। ইরাক ও সিরিয়ার ভূমি বন্টনের ব্যাপারেও খলীফা উমর সাধারণ সভার অধিবেশন ডাকেন যা কয়েকদিন চলে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে খোলাফায়ে রাশেদূন আমলে রাষ্ট্রীয় সমস্যাদির ব্যাপারে জনসাধারণ পরামর্শ দিতে পারত। খলীফাগণ 'বিশেষ পরামর্শ সভা' এবং 'সাধারণ সভা' নামক দু'টি পরিষদের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করতেন। খলীফাগণ দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কাজে কতিপয় বিশেষ সাহাবীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কিন্তু জটিল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাধারণ সভা আহবান করা হতো। বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ছিল। বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত বিভক্ত হলে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত বলবৎ হতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. খোলাফায়ে রাশেদূন দু'ভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তন্মধ্যে একটি হল-
ক. পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক মনোনীত হয়ে; খ. নিজ ক্ষমতা বলে;
গ. নবী (স) তাঁদের মনোনীত করে দিয়েছিলেন; ঘ. কোন উত্তরই সঠিক নয়;

২. প্রথম খলীফা আবু বকর (রা) একজন নির্বাচক দ্বারা খলীফা হয়েছিলেন তিনি হলেন-
ক. হযরত উসমান (রা); খ. হযরত আলী (রা);
গ. হযরত উমর (রা); ঘ. হযরত সায়াদ (রা)।
৩. হযরত উমর (রা) মৃত্যুকালে পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত করার জন্য কি করেছিলেন-
ক. নিজেই খলীফার নাম প্রস্তাব করে গেছেন; খ. কিছুই করে যাননি;
গ. কোন কিছু করার সময় পাননি; ঘ. ছয়জনের একটি নির্বাচক মন্ডলী গঠন করে যান।
৪. সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের পর ঐ অঞ্চলের ভূমি হযরত উমর (রা) -
ক. সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করেছিলেন; খ. রাষ্ট্রীয় আয় ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মূল মালিকদের হাতে ছেড়ে খারাজ নেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন;
গ. নিজের জন্যই রেখেছিলেন; ঘ. বিশিষ্ট সাহাবীর মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন।
৫. শূরার গুরুত্ব কোন খলীফার আমলে কমে যায়?
ক. হযরত উমর (রা)-এর আমলে; খ. হযরত উসমান (রা)-এর আমলে;
গ. হযরত আলী (রা)-এর আমলে; ঘ. হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলে;

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. চার খলীফার নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্ষেপে লিখুন।
২. বাইয়াত বলতে কী বুঝায়? লিখুন।
৩. খলীফা হযরত উমর (রা)-এর আমলে শূরার গুরুত্ব সম্পর্কে লিখুন।
৪. খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলে শূরার গুরুত্ব সম্পর্কে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে শূরা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ ঃ ৫ খোলাফায়ে রাশেদূনের রাজস্ব ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যায়ন করে আপনি—

- খোলাফায়ে রাশেদূন সরকারের রাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন খাত সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- খারাজ বা ভূমি করের হার সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বাইতুলমাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

রাজস্ব আদায়ের খাত

এ সম্পর্কে ৪র্থ ইউনিটে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। মহানবী (স)-এর আমলে রাজস্ব আদায়ের খাত ছিল ৫টি। খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে এর সংখ্যা খুব একটা বৃদ্ধি পায় নি। তবে রাজস্বের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। রাজস্ব আদায়ের খাতও উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। খাতগুলো নিম্নরূপঃ

১। গানীমত, ২। যাকাত, ৩। 'উশর, ৪। জিযিয়া, ৫। খারাজ, ৬। ফাই ও ৭। হিমা।

১. গাণীমত ঃ যুদ্ধের মাঠে শত্রুদের কাছ থেকে যে সব অস্থাবর সম্পদ মুসলিম সৈনিকদের হস্তগত হতো সেগুলোকে গাণীমত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বলা হতো। শরীয়তের আইন অনুসারে উক্ত সম্পদের ৫ ভাগের ৪ ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো এবং অবশিষ্ট ৫ ভাগের ১ ভাগ বায়তুলমালে জমা দেয়া হতো এ ৫ ভাগের ১ ভাগকে খুমুস বলা হতো। বর্তমান যুগে যুদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধে লব্ধ সম্পদের পাঁচ ভাগের চার অংশ বণ্টিত হবে না, কারণ এখন সৈনিকদের বেতন ধার্য করা হয়। এ চার অংশের সবটুকুই বায়তুলমালে জমা হবে।

২. যাকাত ঃ যাকাত একটি শরীয়ত অনুমোদিত একটি ব্যবস্থা। কাজেই এর নিয়ম কানুনে কোন যুগেই পরিবর্তন আসে নি। তবে খলীফা উমর (রা) অশ্বের ওপর যাকাত ধার্য করেন। মহানবীর আমলে আরবদেশে অশ্বের সংখ্যা খুব কম ছিল, সে কারণে তিনি অশ্বের উপর যাকাত ধার্য করেন নি। খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে যুদ্ধবিগ্রহের জন্য অশ্বের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতি বছর বহুসংখ্যক অশ্ব বিদেশ হতে আমদানী করা হতো। ব্যবসায়ীদের কাছে অশ্ব ব্যবসা অতীব লাভজনক ছিল। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে খলীফা উমর (রা) অশ্বের উপর যাকাত ধার্য করেন।

৩. 'উশরঃ 'উশর হল ভূমি রাজস্ব এটিও শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত। এটা কেবল মুসলমানদের উপর ধার্যকৃত ভূমি কর। প্রাকৃতিক পানি দ্বারা ভূমি চাষাবাদ হলে ঐ সব ভূমিতে উৎপন্ন শষ্যের উশর তথা দশভাগের এক অংশ কর ধার্য করা হতো। আর যেসব ভূমি সেঁচের মাধ্যমে চাষাবাদ হতো উক্ত ভূমির উৎপন্ন ফসলে বিশ ভাগের এক ভাগ করা হিসেবে ধার্য ছিল। এ কর তখনই আদায় করা হতো যখন উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ৫ ওয়াসাক বা ৬০ সা' পরিমাণ হতো যার পরিমাণ বর্তমান যুগে ২৬ মণ ১০ সের। খোলাফায়ে রাশেদূন এ কর ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আনেননি।

৪. জিযিয়া ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালগু অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদানের বিনিময় তাদের উপর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে কর ধার্য করা হয় তাকে জিযিয়া বলে। মহানবী (স)-এর আমলে জিযিয়ার পরিমাণ ছিল জনপ্রতি ১ দিরহাম। খলীফা উমর (রা) অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় জিযিয়ার পরিমাণেও সংস্কার সাধন করেন। সাসানী সাম্রাজ্যে প্রচলিত রীতির ন্যায় তিনি জিযিয়া প্রদানকারীদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং আর্থিক সংগতি অনুসারে জিযিয়ার পরিমাণ ধার্য করেন। তিনি বিত্তশালী ব্যক্তিদের জনপ্রতি প্রতি বছরে ৪ দীনার, মধ্যবিত্তদের জনপ্রতি ২ দীনার ও নিম্নবিত্তদের জনপ্রতি ১ দীনার হিসেবে জিযিয়া ধার্য করেন। গরীব, দরীদ্র ও বিত্তহীনদের উপর কোন জিযিয়া ধার্য করা হতো না। তবে এ নিয়মের কিছু কিছু তারতম্য হতো। আমর ইবনুল আস মিসরে জন প্রতি সাধারণভাবে ২ দীনার জিযিয়া ধার্য করেন।

মুসলমানরাই প্রথম জিযিয়া আদায়ের রীতি প্রচলন করে নি। পারস্যের সাসানী সাম্রাজ্যে এবং রোমান সাম্রাজ্যেও এ কর প্রচলিত ছিল। মুসলমানদের সাথে তাদের পার্থক্য ছিল এই যে, রোমান বা সাসানীদের তুলনায় মুসলমানদের দ্বারা ধার্যকৃত জিযিয়ার পরিমাণ ছিল অনেকাংশে লঘু ও মানবিক এবং জিযিয়া কর দাতাদের প্রতি প্রদত্ত শর্ত মুসলমানেরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। কোন বিজিত অঞ্চলের জনসাধারণকে শত্রুর হাত হতে রক্ষা করতে পারবে না এরূপ আশংকা দেখা দিলে মুসলমান শাসকেরা উক্ত অঞ্চলের নাগরিকদের উপর হয় জিযিয়া ধার্যই করত না বা আদায়কৃত জিযিয়ার অর্থ প্রজা সাধারণকে ফেরৎ দিত। ইয়ারমুকের যুদ্ধের পূর্বে রোমানদের প্রস্তুতি দেখে আবু উবায়দা হিমস হতে সৈন্যদের নিয়ে পশ্চাদ পসারণ করেন এবং নগর ত্যাগের পূর্বে হিমস হতে আদায়কৃত জিযিয়ার সমুদয় অর্থ নগরবাসিদের ফেরৎ দেন। খলীফা উসমানের আমলে সাইপ্রাস বিজিত হয়েছিল। কিন্তু সাইপ্রাসবাসির উপর কোন জিযিয়া ধার্য করা হয় নি। কেননা সাইপ্রাস বাসিকে শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করা সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে আরবদের মনে সন্দেহ ছিল। খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে কেবল অমুসলমান প্রজাকেই জিযিয়া দিতে হতো এবং কোন অমুসলিম প্রজা মুসলমানদের সাথে সামরিক অভিযানে অংশ গ্রহণ করলে বা কোন প্রকারে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্যদান করলে সে বছরের জন্য তার জিযিয়া মওকুফ হয়ে যেত।

৫. **খারাজঃ** অমুসলিমদের সম্পত্তিকে খারাজি সম্পত্তি বলে। খারাজ ছিল ভূমি রাজস্ব। অমুসলিমদের রাজ্য বিজয়ের পর যে ভূমি মুসলিমদের হস্ গত হতো তাকে খারাজী ভূমি বলে। মহানবীর (স) আমলে খারাজী ভূমির পরিমাণ ছিল অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে পারস্য এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিশাল এলাকা বিজিত হওয়ায় খারাজী ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং রাজস্বের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হয়।

এ সব সম্পত্তির আয় জনহিতোকর কার্যের জন্য পৃথক করে রাখা হতো। ইসলামের স্বার্থে উল্লেখযোগ্য সেবার জন্য ব্যক্তি বিশেষকে এ ভূমি হতে কিছু কিছু ইনাম বা পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা হতো। কিন্তু কোন ক্রমেই উক্ত সম্পত্তির খারাজ রহিতো হতো না।

খারাজের হার ঃ খারাজী ভূমির খারাজ (কর) ফসলের ধরণ ও প্রকার হিসেবে নির্ধারিত হতো। যেমন

ক. যব আবাদ উপযোগী ভূমির খারাজ।
খ. গম বা আখ আবাদ উপযোগী ভূমির খারাজ।
গ. শাকসব্জী আবাদযোগ্য ভূমির খারাজ।
ঘ. তুলা আবাদযোগ্য ভূমির খারাজ।
ঙ. খেজুর ও আঙ্গুর আবাদযোগ্য ভূমির খারাজ।

৬. **ফাই** ঃ শত্রূদের বিরূদ্ধে বিজয় লাভ করার পর যে সব স্থাবর সম্পত্তি বা ভূমি মুসলিমদের মালিকানায় এসে যেত তাহল ফাই ভূমি। ফাই শ্রেণীর ভূমিগুলো সরাসরি রাষ্ট্রের দখলে আসত। ভূমির প্রকৃত মালিক বর্গাদারকে চাষাবাদের অধিকার প্রদান করে ভুমি হতে যেরূপ আয় পেয়ে থাকে, মুসলিম রাষ্ট্র ফাই ভূমি হতেও অনুরূপ আয় পেত। খারাজী ভূমি হতে এর প্রভেদ এই যে, এটা হতে রাষ্ট্র নির্দিষ্ট খারাজ পেয়ে থাকে। কিন্তু ফাই ভূমি হতে রাষ্ট্র ভূমির মালিক হিসেবে উৎপাদিত ফসলের অংশ পেত। হযরত উমর (রা) এর সম্পত্তির আয় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও জন কল্যাণের জন্য বায়তুলমালে জমা রাখতেন।

৭. **হিমা বা পশুচারণ ভূমি ঃ** খলীফা উমর পশু চারণ ক্ষেত্র হিসেবে বিশাল বিশাল এলাকা খাস করে রাখেন। এসব ভূমিতে যাদের পশু চরত তারা রাষ্ট্রকে পশু কর দিত। তাঁর আমলে উক্ত পশুচারণ ক্ষেত্র থেকে পাওয়া পশুর পরিমাণ ছিল ৪,০০,০০০। এ পশুগুলো কর হিসেবে আদায় করা হয়।

বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা

বায়তুলমাল বা সরকারী কোষাগারে সাধারণভাবে রাষ্ট্রের সকল আয় জমা হতো। কিন্তু জমা দেয়ার সময় তা ৪টি প্রধান খাতে বিভক্ত করে জমা দেয়া হতো।

১. প্রথম খাতে জমা হতো গাণীমত এবং সদকার মাল।
২. দ্বিতীয় খাতে জমা পড়ত যাকাত ও 'উশূর।
৩. তৃতীয় খাতে জমা পড়ত অমুসলিমদের নিকট হতে আদায়কৃত 'খারাজ', 'জিজিয়া', 'ফাই'-এর মাল।
৪. চতুর্থ খাতে জমা হতো বিবিধ আয়ের অর্থ ।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এবং আবু বকর (রা)-এর আমলে বায়তুলমাল বা সরকারী কোষাগার ছিল না। অর্থ রাজধানীতে পৌঁছা মাত্র তা বন্টন করে দেয়া হতো। কিন্তু ওয়ালীদ ইবন হিশামের পরামর্শ ক্রমে খলীফা উমর (রা) মদীনায় সর্বপ্রথম কোষাগার বা বায়তুলমাল স্থাপন করেন এবং আবদুল্লাহ ইবন আরকামকে এর কোষাধ্যক্ষ

নিযুক্ত করেন। রাজধানী মদীনা এবং অন্যান্য প্রাদেশিক রাজধানীতে কোষাগারের জন্য ঘর নির্মাণ করা হয় ও এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। কোষাধ্যক্ষগণ ওয়ালী বা গভর্নর থেকে স্বাধীন ছিলেন। কুফার গভর্নর সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাসের সাথে আর্থিক ব্যাপারে কুফার কোষাধ্যক্ষ ইবনে মাসুদের মতানৈক্য হওয়ায় খলীফা উসমান সা'দকে পদচ্যুত করেন।

উমরের দীওয়ানঃ খলীফা উমর (রা)-এর আমলে অনেক সম্পদ মদীনার কোষাগারে এসে জমা হয়। সে সব সম্পদের সুষ্ঠু আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য খলীফা উমর প্রথম দীওয়ান (Secretariat) নামক একটি স্থায়ী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য দীওয়ানকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম ভাগে আয়ের ও দ্বিতীয় ভাগে ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষিত হতো। আয়ের প্রধান প্রধান উৎসগুলো ছিল 'আল-খুমস, 'আল-জিযিয়া', ';খারাজ', 'উশর', 'অর্ধউশূর', 'ফাই', 'যাকাত' ও 'সাদকা' এবং হিমা'। ব্যয়ের খাতগুলো ছিল যথাক্রমে-

১. গরীব, দুঃখীর সাহায্য, আদায়কারীর ভাতা, দাসমুক্তি, অক্ষম ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ আল্লাহর পথের মুজাহিদ এবং পথিকদের সাহায্য দান।
২. বেসামরিক খাতের ব্যয়ভার নির্বাহ।
৩. সামরিক বিভাগের ব্যয়ভার নির্বাহ।
৪. জনহিতোকর কার্য সম্পাদন।
৫. অনাথ ও বেওয়ারিশ শিশুর লালন-পালন।
৬. সাধারণ ভাতা দান।

দীওয়ানে রক্ষিত তালিকা অনুসারে বেসামরিক ও সামরিক ব্যয় মিটানোর পর অবশিষ্ট অর্থ থেকে সকল মুসলমানকে নিয়মিত ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি সকল মুসলমানের তালিকা প্রস্তুত করে ভাতা দানের প্রথা প্রবর্তন করেন। মহানবীর স. আত্মীয়বর্গ ও ইসলামের আত্যাগ এবং ইসলাম গ্রহণের সময়কালের ভিত্তিতে তিনি ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রেণীভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করেন। সে তালিকাতে দাসগণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ব্যয়ের খাতে বেসামরিক বিভাগকে প্রথম ও সামরিক বিভাগকে দ্বিতীয় গুরুত্ব দেয়া হয়।

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

নৈব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে রাজস্ব আদায়ের একটি নতুন খাত হল-
ক. উশর; খ. জিযিয়া;
গ. গনীমত; ঘ. হিমা।

২. গনীমত ও ফাই-এর মধ্যে পার্থক্য হল-
ক. গনীমত হল শত্রুদের কাছ থেকে লব্ধ সম্পদ; খ. ফাই হল শত্রুদের কাছ থেকে লব্ধ স্থাবর সম্পদ
গ. গনীমত হল শত্রুদের কাছ থেকে লব্ধ অস্থাবর সম্পদ ঘ. খ ও গ উভ উত্তর সঠিক।

৩. উশর ফরয হওয়ার জন্য উৎপাদিত ফসল কি পরিমাণ হতে হয়
ক. ২৬ মণ; খ. ২৬ মণ ৫ সে;
গ. ২৬০ মণ; গ. ২৬ মণ ১০ সের।

৪. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে খারাজের হার কি অনুসারে নির্ধারিত হতো-
ক. ফসলের ধরণ অনুসারে; খ. ভূমির প্রকার অনুসারে;
গ. ফসলের ধরণ ও ভূমির প্রকার অনুসারে; ঘ. সব ফসলে একই হার ধার্য ছিল।

৫. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে রাষ্ট্রের সকল আয় বায়তুলমালে কয়টি প্রধান খাতে জমা হতো?
ক. ২টি; খ. ৫টি;
গ. ৭টি; ঘ. ৪টি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. খোলাফায়ে রাশেদূনের এর আমলে রাজস্ব আদায়ের খাত কয়টি ছিল ? প্রত্যকটির সংজ্ঞা লিখুন।
২. গনীমত ও ফাই-এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন।
৩. খারাজ ও জিযিয়া করের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।
৫. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে সকল আয় বায়তুলমালে কয়টি প্রধান খাতে জমা হতো এবং সেগুলো কী কী?
৬. যাকাত ও উশরের বর্ণনা দিন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে রাজস্ব আদায়ের খাতগুলো কী কী ? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

পাঠ ঃ ৬ খোলাফায়ে রাশেদূনের সামরিক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- ◆ খলীফা আবু বকর (র)-এর সামরিক নীতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ◆ খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে সামরিক ঘাঁটি ও ইরাফা সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ◆ খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে সৈন্যদের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ◆ খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে সৈনিকদের শ্রেণী, বেতন-ভাতা ও স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে অস্ত্র-সস্ত্র সৈন্য সংখ্যা ও গোয়েন্দা বিভাগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সামরিক বিভাগ

মহানবী (স) মদীনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন সাধারণভাবে সে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক দেশরক্ষার দায়িত্ব পালন করত। খোলাফায়ে রাশেদূনের যুগেও সে আদর্শ বলবৎ ছিল। প্রাপ্ত বয়স্ক সব মুসলমানকে দেশরক্ষা ও জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে হতো এবং প্রয়োজনের সময় সকল প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগদান ছিল অবশ্য কর্তব্য।

সামরিক নীতি ঃ খলীফা আবু বকর (রা) বিদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহীদের দমনের জন্য ১১টি বৃহৎ অভিযান প্রেরণ করেন এবং প্রত্যেকটি অভিযানই সফলকাম হয়। তাঁর শাসনকালেই সমসাময়িক বিশ্বের বৃহত্তম দু'টি সাম্রাজ্যের সাথে আরবদের সীমান্ত সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সে কারণে সামরিক বাহিনীকে নিয়মিত ও শৃংখলাবদ্ধ ভাবে সংগঠিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। খলীফা উমর আরবদের বিশুদ্ধ সামরিক জাতি হিসেবে গড়ে তুলার জন্য বিজিত দেশের ভূমি সৈন্যদের মধ্যে বন্টন প্রথা রহিতো করেন এবং মুসলমানদের বিজিত দেশে ভূমি ক্রয় করতে নিষেধ করেন। কেননা মুসলমানগণ ছিলেন সাধারণভাবে "আল্লাহর সৈনিক" এবং যুদ্ধের জন্য যে কোন মুহূর্তে তাদের স্বল্পসময়ের মধ্যে স্থানান্তরিত হতে হতো।

খলীফা আবু বকরের (রা) শাসনকালে আরবগণকে যদিও সংকটজনক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয় তবুও সৈন্যবাহিনী সংগঠনের প্রাপ্ত কৃতিত্ব খলীফা উমরের। তিনি সৈন্যবাহিনীর জন্য নিয়মিত বেতন ও আনুষাঙ্গিক রেশন প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সৈনিকদের নিয়মিত বেতন ও রেশনসহ পারিবারিক ভাতা প্রদান প্রথা চালু করে বিশ্বে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

সামরিক ঘাঁটি ঃ খলীফা উমর সমগ্র সাম্রাজ্যকে ৯টি জুনদ বা সামরিক জেলায় (Military districts) বিভক্ত করেন। জুনদগুলো হচেছ মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা, মৌসুল, ফুসতাত, মিসর, দামেস্ক, হেমস এবং প্যালেসটাইন। স্থানগুলোতে সামরিক ঘাটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল এবং প্রত্যেক ঘাটিতে ৪০০০ করে অশ্বারোহী বাহিনী সর্বদা মওজুদ থাকত। অশ্বগুলোর উরুতে "আল্লাহর পথের অশ্ব" এ বাক্যটি ছাপ দেয়া থাকত। এ সব প্রধান প্রধান সামরিক কেন্দ্র ছাড়াও সাম্রাজ্যের সকল শহরে, সীমান্ত এলাকা এবং উপকূলবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সামরিক চৌকী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে পশুর জন্য পশুচারণ ক্ষেত্র, সৈনিকের জন্য খাদ্য এবং যুদ্ধের জন্য যাবতীয় সরঞ্জাম মওজুদ থাকত। সৈনিকদের বেতন প্রদানের জন্য একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। তাকে বলা হতো আল-আরীফ।

ইরাফা ঃ বেতন প্রদানের সুবিধার জন্য ঘাঁটিতে অবস্থানকারী সৈন্যদলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করা হতো। এক একটি বিভাগকে ইরাফা বলা হতো। প্রথম দিকে প্রত্যেক ইরাফায় দশ দশজন করে সৈনিক ছিল। বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক ইরাফা পরবর্তীকালে আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং খলীফা উমর কাদেসীয়ার যুদ্ধে ৪৩ জন সৈনিক দ্বারা এক একটি ইরাফা গঠন করেন। প্রত্যেক ইরাফায় মহিলাও ছিল। এক একটি ইরাফার ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১,০০,০০০ দিরহাম। পরবর্তীকালে ইরাফার সদস্য সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়।

সৈন্যদের বিভিন্ন বিভাগ ঃ কার্যকারীতার দিক থেকে সৈন্য বাহিনী প্রধানত ছয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল। সেগুলো হচ্ছে পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দায, স্কাউট, রিয়ার স্কাউট (Rear Scout) এবং গিলমান (Servce corps| খলীফা উমর ও উসমানের শাসনকালে সিরিয়ার আমীর মুয়াবীয়া (রা) সর্বপ্রথম দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন। সিফফীনের যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হতে মুয়াবীয়ার (রা) দেহরক্ষী বাহিনীই তাঁকে রক্ষা করে।

সৈনিকদের শ্রেণী ঃ সৈনিকগণ নিয়মিত ও অনিয়মিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। নিয়মিত সৈন্যগণ ব্যারাকে অবস্থান করত এবং নিয়মিত বেতন পেত। অনিয়মিত সৈন্যগণকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সামরিক শিক্ষা দেয়া হতো এবং প্রয়োজনের সময় রাষ্ট্রের আহ্বানে তারা যুদ্ধে গমন করত। তাদের সরকারী ভাতার পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম।

প্রতি দশজন সৈনিকের উপর একজন করে আমীরুল আশরাহ, প্রতি দশজন "আমীরুল আশরাহ"-র উপর একজন করে কায়েদ বা লেফটেন্যান্ট এবং প্রতি দশজন কায়েদের বা ১০০০ জন সৈনিকের উপর একজন করে আমীর নিযুক্ত করে সৈন্যবাহিনীর শৃংখলা বিধান করা হতো। অধীনস্থ সৈনিকগণ নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করত।

সৈনিকদের বেতন ভাতা ঃ নিয়মিত সৈন্যদের বেতন ছিল আকর্ষণীয়। প্রথম দিকে তাদেরকে বাৎসরিক ২০০ দিরহাম বেতন দেয়া হতো। তা ক্রমশঃ ৩০০০ দিরহামে উন্নীত হয়। বেতন ছাড়াও একজন সৈনিক গানীমতের অংশ, খাদ্য, বস্ত্র ও পারিবারিক ভাতা পেত। একজন সৈন্য বৎসরে গড়ে ৬০০০ দিরহাম পেত। একজন সামরিক অফিসার বেতন হিসেবে সর্বমোট ৭০০০ হতে ১০,০০০ দিরহাম পেতেন। অশ্বারোহী পদাতিকের দ্বিগুণ বেতন পেত।

সৈনিকদের অন্যান্য সুবিধা

সৈন্যবাহিনীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার উপর গুরুত্ব দেয়া হতো। সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থানে সেনানিবাস নির্মাণ করা হতো। প্রথম অবস্থায় সৈন্যদের রসদ বিভাগ নিয়মিত সেবাদান করতে পারত না। সে কারণে 'আহরা' নামক পৃথক একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখানে সৈনিকদের রেশন দ্রব্য গচ্ছিত থাকত এবং মাসের প্রথম তারিখে ক্যাম্পে প্রেরিত হতো। রেশন হিসেবে প্রতি মাসে একজন সৈন্য ১ মন ১০ সের শস্য, ১২ সের খাবার তৈল এবং ১২ সের সিরকা পেত। তা ছাড়া সৈনিকদের প্রত্যেককে সুঁই, তুলা, কাঁচি, খাবার ব্যাগ, চালুন ইত্যাদি দেয়া হতো। প্রত্যেক সেনাদলে থাকতেন একজন খাজাঞ্চি, একজন হিসাব নির্বাহী, একজন কাযী, কয়েকজন দোভাষি, কয়েকজন ডাক্তার ও অস্ত্রপাচারে অভিজ্ঞ চিকিৎসক। রসদ বিভাগের প্রথম অফিসার ছিলেন আমর ইবন উতবা।

সৈন্যসংখ্যা ঃ খলীফা আবুবকর (রা) সিরিয়া অভিযানে ৭০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। পরবর্তিতে উক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে খলীফা উমরের সময় ২৭০০০ উন্নীত হয়। ইয়ারমুকের যুদ্ধে খালিদ আরও ৯০০০ সৈন্য নিয়ে সেখানে পৌছলে ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ৩৬,০০০ হাজারে দাঁড়ায়। অপর পক্ষে বিজাতীয় সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২,৪০,০০০। কাদেসীয়ার যুদ্ধে প্রকৃত পক্ষে কত আরব সৈন্য অংশ গ্রহণ করে তা নিয়ে মতান্তর রয়েছে। সেতুর যুদ্ধে সেনাপতি আবু উবায়েদ ইবন মাসুদের নেতৃত্বে ৫০০০ মুসলিম সৈন্য ছিল। ঐতিহাসিক তাবারীর বর্ণনা অনুসারে কাদেসীয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুসলিম সৈন্যের সংখ্যা ৭০০০, বালাযুরীর মতে কাদেসীয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সৈন্যবাহিনীতে খাটি আরব সৈন্য ৫০০০ এবং অন্যান্য মুসলমান সৈন্য ছিল ১০০০। আমর ইবনুল আস ৪০০০ সৈন্য নিয়ে মিসর বিজয়ে অগ্রসর হন। পরে আরও অনুরূপ সংখ্যা তাঁর সেনাদলে ভর্তি হয়। ইবনে সাদ এর এক বিবরণ হতে জানা যায় যে, প্রতি বছর ৩০,০০০ সৈন্য ভর্তি করা হতো। এই সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন জাতির লোক সৈন্য বিভাগে চাকুরী লাভ করে। সিফফীনের যুদ্ধে মুয়াবীয়ার (রা) সৈন্যসংখ্যা ছিল ৮৫,০০০ এবং হযরত আলীর (রা) সৈন্যসংখ্যা ছিল ৯০,০০০। প্রতিটি সেনানিবাসে ৪০০০ করে অশ্বারোহী সৈন্য মওজুদ থাকত। সে হিসেবে ৯টি জুনদে ৩৬,০০০ অশ্বারোহী সর্বদা প্রস্তুত থাকত।

নৌবাহিনী ঃ মরুবাসী আরবগণ সাগর দেখে ভয় পেত। সে কারণে প্রথম দিকে তারা নৌপথে তেমন রণকৌশণ দেখাতে পারে নি। বিশেষ ভাবে লোহিতো সাগর ও ভারতের পথে পারস্য উপসাগরে দু'টি নৌ অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলে খলীফা উমর (রা) সকল প্রকার নৌ-অভিযান নিষেধ করে দেন। বর্ণিত আছে যে, রোমানদের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান পরিচালনার জন্য সিরিয়ার আমীর মুয়াবীয়া (রা) খলীফা উমরের নিকট নৌবাহিনী গঠনের আবেদন করে বিফল মনোরথ হন। খলীফা উসমানের শাসনকালে মুয়াবীয়া (রা) নৌবাহিনী

গঠনের অনুমতি লাভ করেন। কিন্তু কেবল স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা নৌবাহিনী গঠনের অনুমতিই প্রদান করা হয় এবং কাউকে নৌবাহিনীতে যোগদান করতে বাধ্য করতে নিষেধ করা হয়। মুয়াবীয়া (রা) আবু কায়িসের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম নৌবাহিনী গঠন করেন। বর্ণিত আছে যে, মুয়াবীয়া (রা) নৌপথে ৫০টি গ্রীষ্ম ও শীতকালীন অভিযান প্রেরণ করেন। এসব অভিযানের উদ্দেশ্য সাইপ্রাস বিজয় বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। ৩০ হিজরী সালে মুসলিম নৌবহর এত শক্তিশালী হয় যে, উহা রোড্স দ্বীপ দখল করে। মুসলিম নৌবাহিনীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হচ্ছে ৩৪ হিঃ সালে বাইযানটাইন নৌবাহিনীকে পরাজিত করা। সে অভিযানে এ্যাডমিরাল ইবনে আবী সারাহ ২০০ আরব রণতরীর সাহায্যে প্রায় ৬০০ রণতরীর বিশাল বাইযানটাইন বাহিনীকে পরাজিত করে। মুয়াবিয়ার শাসনকালেই আরব নৌবহর ভূমধ্যসাগরে গ্রীক প্রাধান্য ধ্বংস করে আরব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত আরব নৌবাহিনীতে মাঝি, মাল্লাগণ ছিল গ্রীক বা মিরসীয় কপট। অভিযানগুলো প্রায়ই প্রেরিত হতো আফ্রিকার বিভিন্ন উপকূলবর্তী এলাকা হতে। নৌ-সৈন্যগণ বেতন ও ভাতা পেত। নাবিকগণ যুদ্ধে অংশগ্রহ করত না।

অস্ত্রশস্ত্র ঃ তরবারী, বর্শা, তীরধনুক, ক্ষেপনাস্ত্র ও ফিঙ্গা প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আত্মরক্ষার জন্য ঢাল এবং জেরা ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহৃত হতো। জেরার মূল্য ছিল খুব বেশী। সে কারণে জেরা বা ধর্মধানী সৈন্যের সংখ্যা ছিল খুব কম। আরবদের তরবারী ছিল দ্বিধারী। তাদের তীরের আকার ছিল ছোট এবং তীক্ষ্ণ। সে কারণে পারসিকগণ তাকে আলপিন বলত। প্রাকার বেষ্ঠিত দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রস্তর নিক্ষেপক ক্ষেপণাস্ত্র এবং দাব্বাবাহ (mantelets) ব্যবহৃত হতো।

পতাকা ঃ জাতীয় পতাকা উত্তোলনের রীতি সব দেশের সকল যুগে বর্তমান ছিল ও আছে। আরবগণ যুদ্ধক্ষেত্রে পতাকা বহন করত। তা সাধারণত সেনাপতির সঙ্গে থাকত। তা বহন করার জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করা হতো সে প্রাণ দিয়েও পতাকার মান রক্ষা করত। যুদ্ধ আরম্ভ হবার ইঙ্গিত হিসেবে পতাকা ব্যবহার করা হতো। সেনাপতি প্রথমবার পতাকা হেলন করে সৈন্যদেরকে প্রস্তুতির আদেশ দিতেন। সৈনিকগণ উক্ত নিদর্শন দেখামাত্র জরুরী কার্যাদি ও প্রাকৃতিক আহ্বানের সাড়া দিয়ে অজু করে প্রস্তুত হতো। সেনাপতি দ্বিতীয়বার পতাকা নাড়ালে প্রত্যেকে যুদ্ধসাজ পরে ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকত এবং তৃতীয়বার পতাকা নাড়ালে শৃঙ্খলার সাথে সৈনিকগণ শত্রুর উপর আক্রমণ চালাত। আত্মসমর্পণের জন্যও পাতাকা দেখানোর রীতি প্রচলিত ছিল। তবে আত্মসমর্পণের জন্য অস্ত্রত্যাগ করতঃ হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকলে যুদ্ধ বন্ধ হতো। সিফফীনের যুদ্ধে মুয়াবিয়া (রা)-এর সৈন্যগণ পবিত্র কুরআনের কপি উত্তোলন করে দেখালে আলীর (রা) সৈন্যগণ অস্ত্র সংবরণ করে।

গোয়েন্দা বিভাগ

প্রথম হতে আরবদের গোয়েন্দা ব্যবস্থা দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতো। বিশেষভাবে যুদ্ধের সময় গোয়েন্দা বিভাগকে সতর্কতার সাথে কাজ করতে হতো। সিরিয়া ও ইরাকে বসবাসকারী আরবগণ- যারা ইসলাম গ্রহণ করে, তারা আকৃতি ও প্রকৃতিতে খ্রীষ্টানদের অনুরূপ ছিল। সে কারণে গোয়েন্দাগিরিতে তারা অভূতপূর্ব সাফল্য প্রদর্শন করে। অনেক সময় শাসকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অমুসলমান প্রজাগণও মুসলমানদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করত।

অগ্রাভিযান ঃ কোন অভিযানে অগ্রসর হওয়ার সময় প্রথমে স্কাউট বাহিনী অগ্রসর হতো। তারা পথের ও শত্রু বাহিনীর খোঁজ খবর নিত ও মূল বাহিনীকে তা অবগত করত। মুলবাহিনী অগ্রভাগ, মধ্যভাগে ও ডান বাহু এবং পশ্চাদভগ ও বামবাহু এ কয়টি অংশে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধসাজে ও সামরিক কায়দায় গমন করতো। একটি অংশ পশ্চাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে মূল বাহিনীর অনুসরণ করতো। সবার পশ্চাতে আবার স্কাউট বাহিনী তত্ত্বাবধায়কের ন্যায় গমন করত। গমনপথে প্রতি শুক্রবারে পুর্ণ ২৪ ঘন্টা বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হতো।

শিবির ঃ শত্রু এলাকায় শিবির পাহারার ব্যবস্থা করা হতো। শিবিরের চতুর্দিকে অগ্নি খন্দক, ব্যারিকেড ও প্রহরার ব্যবস্থা করা হতো। সৈনিকগণ ঘুমানোর সময় স্ব স্ব অস্ত্র সাথে নিয়ে ঘুমাত এবং যে কোন মুহূর্তে শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকত। প্রহরীগণও খুব সতর্ক থাকত এবং তাদের কেবল সে কাজের জন্য নিযুক্ত করা হতো। শিবির প্রহরীকে বলা হতো আল-রায়েদ।

যুদ্ধেকৌশল ঃ যুদ্ধকৌশলের দিক দিয়েও মুসলিমগণ যথেষ্ট কৌশলের পরিচয় দিয়েছিল। মহানবীর আমল হতেই যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধভাবে সৈন্য সমাবেশ ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে অগ্রসর হওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে পারসিক ও রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মুসলিম বাহিনী আরও রণকৌশলী ও যুদ্ধদক্ষ হয়ে উঠে।

আরব মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ও রণসম্ভার কম ছিল বলে বৃহৎ শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য তাদেরকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হতো এবং রণকৌশল উদ্ভাবন করতে হতো। আল-ওয়া-লাজার যুদ্ধে খালিদ ইবনে-ওয়ালিদ কিছু সৈন্যকে শত্রু সৈন্যের উভয় পার্শ্বে লুকিয়ে রাখেন। যুদ্ধ যখন ঘোরতর হয়ে উঠে তখন ওঁৎ পেতে অপেক্ষমান সৈনিকগণ হঠাৎ শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদেরকে পরাজিত করে। কাদেসীয়ার ভয়াবহ যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদের তিন সারিতে সাজানো হয়। অথচ শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ ১৩টি সারিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে। পারসিক সৈনিকদের তীরের আঘাতে মুসলিম বাহিনী ভয়ানক ক্ষতি স্বীকার করেও সে অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকে। তারা তীর ও বর্শা নিয়ে প্রাণপণে আক্রমণ চালায় এবং আরও নিকটবর্তী হয়ে বর্শা রেখে তরবারী নিয়ে আক্রমণ চালায় ও বিজয় লাভ করে।

পারসিক হস্তীবাহিনীর সাথে যুদ্ধে আরব মুসলিমগণ ভয়ানক বিপদে পড়ে। কারণ ইতিপূর্বে তারা হস্তী বাহিনী সঙ্গে যুদ্ধ করে নি। বিরাটাকার হস্তীবাহিনী বহু নামকরা সেনার প্রাণনাশ করে। আরব যুদ্ধাশ্বগুলোও বিরাটাকার জন্তু দেখে ভীত হয়ে পড়ে। সেনাপতি সা'দ সে অবস্থা দেখে দাখাম ও সালাম নামক দু'জন পারসিক মুসলমানকে হস্তী যুদ্ধের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। তারা হস্তীযুদ্ধ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখতেন। তাঁরা পরামর্শ দিলেন যে কোন ক্রমে যদি দলপতি হস্তীদ্বয়ের শুড়ে ও চক্ষে আঘাত করা যায় তবে হস্তীবাহিনী দলবলসহ যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করবে। সেনাপতি সা'দ তৎক্ষণাৎ সুকৌশলী কা'কাকে উক্ত সংবাদ জ্ঞাপন করলেন।

হস্তী দলপতিদ্বয়ের নাম ছিল আবিয়াদ ও আযরাদ। কা'কা একদল সৈনিককে হস্তীবাহিনীর গমন পথ অবরোধের জন্য প্রেরণ করে স্বয়ং বর্শা হস্তে আবিয়াদ নামক শ্বেত হস্তীর দিকে অগ্রসর হলেন। আসিম নামক অপর এক বীর, তরবারী ও বর্শা হস্তে তাঁর সঙ্গী হলেন। উভয়ে হস্তীর নিকটবর্তী হয়ে একসঙ্গে দু' খানা বর্শা হস্তীর দু' চক্ষু লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন। বর্শাদ্বয় লক্ষ্যস্থলে বিদ্ধ হওয়া মাত্র হস্তী বিকট চীৎকার করে উঠল এবং কা'কাও সাথে সাথে তার শুড় আক্রমণ করে তরবারীর এক আঘাতে তা কর্তন করে ফেললেন। অপরদিকে হাম্মাল ও রাবীল নামক দু' আরব বীরও আযরাদ নামক দ্বিতীয় সরদার হস্তীকে অনুরূপভাবে ঘায়েল করেন। বিকট চীৎকার করে প্রকা⁼ জন্তুদ্বয় পশ্চাৎ ফিরে ছুটতে আরম্ভ করে। তাদের পশ্চাৎ হস্তীবাহিনীও ছুটতে শুরু করে। ফলে তাদের পায়ের তলায় পড়ে হাজার হাজার পারসিক সৈন্য পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারায়। মুসলমান সৈনিকগণ সুযোগ বুঝে শত্রু পক্ষের উপর আক্রমণ চালায় ও জয়লাভ করে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪০,০০০ এবং রোমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ২৪০,০০০। চল্লিশ হাজার সৈন্যকে মাত্র কয়েকটি সারিতে সাফবন্দী করে রণক্ষেত্রে দন্ডায়মান করা অসম্ভব ছিল বলে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ সৈন্যদেরকে ৩৮টি স্কোয়াড্রনে বিভক্ত করে সাজান। কেন্দ্রে ছিল ১৮টি স্কোয়ারড্রন বা কারদুস (বহুবচন, কারাদিস) এবং দক্ষিণ ও বাম বাহুর প্রত্যেকটিতে ছিল দশ দশটি করে স্কোয়াড্রন বা কারদুস। প্রত্যেক স্কোয়াড্রন ছিল গোত্রভিত্তিক এবং স্ব স্ব নেতার অধীন। প্রথমে উভয় বাহু শত্রুর মুকাবিলায় অগ্রসর হয়। তারা যুদ্ধে রত হলে খালিদের নির্দেশে কেন্দ্র অগ্রসর হয়ে রোমানদের পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। ফলে রোমানদের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এটা মুসলমানদের পক্ষে শুভ হয়।

উপসংহারে আমরা এ বিষয়ে একমত যে মহানবী গোত্রবিভক্ত আরবদেরকে সাধারণ লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য যে শৃংখলাজ্ঞান দান করেন সে আদর্শ ধরে আরবগণ তাঁর তিরোধানের পর আরও সুসংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয় এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেই তারা বিশ্ববিজয়ী শক্তিতে পরিণত হয়। দু'টি বৃহৎ শক্তির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সমসাময়িক বিশ্বে প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তি হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। উন্নত মানের যুদ্ধ কৌশল, সুষ্ঠু অবরোধ পরিকল্পনা, নানা প্রকার যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশ, ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রের ব্যবহার প্রভৃতি সবদিক দিয়ে তারা প্রতিশ্রুতিবান সামরিক বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বৈর্ন্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত আবু বকর (রা) ধর্মাদ্রোহী ও বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য কয়টি অভিযান প্রেরণ করেন?
ক. ৭টি; খ. ৫টি;
গ. ৩টি; ঘ. ১১টি।

২. সমগ্র সাম্রাজ্যকে নয়টি সামরিক জেলায় বিভক্ত করা হয় কোন খলীফার আমলে?
ক. হযরত উসমান (রা); খ. হযরত আলী (রা);
গ. হযরত আবু বকর (রা); ঘ. হযরত উমর (রা)।

৩. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে বেতন দেয়ার সুবিধার্থে বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্য দলকে কি বলা হতো?
ক. স্কাউট; খ. ইরাফা;
গ. পদাতিক; ঘ. বিয়ার স্কাউট।

৪. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে কার্যকারীতার দিক থেকে সৈন্য বাহিনীকে কয়ভাগে বিভক্ত করা হতো?
ক. ছয় ভাগে; খ. নয় ভাগে;
গ. তিন ভাগে; ঘ. পাঁচ ভাগে।

৫. হযরত উমর (রা) সমগ্র আবর সাম্রাজ্যকে কয়টি সামরিক জেলায় বিভক্ত করেন?
ক. ৮টি; খ. ৯টি;
গ. ১৫টি; ঘ. ১০টি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে সামরিক ঘাটি ও ইরাফা সম্পর্কে লিখুন।
২. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে সৈন্যদলের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে লিখুন।
৩. খোলাফায়ে রাশেদূন আমলে সাধারণত কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হতো?
৪. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে সৈনিকদের বেতন ভাতা ও স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৫. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে গোয়েন্দা বিভাগ ও অগ্রাভিযান সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. খোলাফায়ে রাশেদূনের সামরিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. খোলাফায়ে রাশেদূনের আমলে যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

হযরত উমরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা

পাঠ ঃ ৭

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- হযরত উমর (রা)-এর প্রশাসনিক কাঠামোর বর্ণনা দিতে পারবেন;
- মজলিসে শূরার গঠন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বলতে পারবেন;
- হযরত উমর (রা)-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

ইসলামের ইতিহাসে হযরত উমর (রা) সুযোগ্য, উপযুক্ত একজন বিচক্ষণ ও দক্ষ প্রশাসক হিসেবে সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেন। তাঁর অনুসৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আধুনিক শাসনের মূল কাঠামো। তিনি তাঁর প্রশাসনকে এরূপ একটি সুষ্ঠু, সুসংহতো, সুগঠিত ও সুদূর প্রসারী হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন যা বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করেছিল। রাসূলে করীম (স) ও হযরত আবু বকর (রা) ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের বীজ বপন করেন, হযরত উমর (রা) তাঁর পূর্ণরূপ দান করেন। হযরত উমরের (রা) খিলাফত হল রাসূল কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হযরত উমর (রা)-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থা এত বেশী সুদৃঢ় ও শক্তিশালী ছিল যে, যার সাহায্যে তিনি একে একে বিভিন্ন দেশ, শহর ও শহরতলী দখল করেছিলেন। তাঁর আমলে ১০৩৬টি শহর বিজিত হয়েছিল।

হযরত উমর (রাঃ)-এর শাসন ব্যবস্থায় একনায়কত্বের কোন ছোঁয়া ছিল না তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে খলীফা মনোনয়ন করতেন। তিনি পরামর্শ সভার মতামত অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করতেন। তিনি সাম্য, ঐক্য ও ভাতৃত্বের বন্ধন দিয়ে জন কল্যাণকর প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। হযরত উমর (রা) -এর প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে নিম্নে আলোচিত হল।

মজলিসে শূরা গঠন ঃ হযরত উমর (রাঃ)-এর গণতান্ত্রিক শাসননীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রধান দিক ছিল মজলিসে শূরা বা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন। তিনি যে কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হলে আল-কুরআন ও আলহাদীসের ভিত্তিতে শূরার সাহায্যে তা সমাধান করতেন। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতেন যে, পরামর্শ ছাড়া কোন খিলাফত চলতে পারে না। বস্তুতঃ তাঁর শাসনামলে পরামর্শ সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে।

বস্তুত: তাঁর শাসনামলে শূরা গুরূত্বপূর্ণ রূপ লাভ করে। তাঁর শাসনামলে সাধারণ সভা দু'বার আহুত হবার বিবরণ জানা যায়।

প্রথমত: কাদেসীয়ার যুদ্ধের পূর্বে তিনি স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করবেন কিনা সে বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য তিনি সাধারণ সভা আহবান করবেন। উক্ত সভা খলীফাকে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করার পক্ষে রায় প্রদান করেন। তিনি হয়ত আলীকে খিলাফতের ভার দিয়ে সেনা বাহিনীর সাথে গমন করেন। কিন্তু মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে সিরার নামক জলাসয়ের নিকট আহল আল-রায় বা শূরার প্রতিনিধিদের আহবান করে উক্ত বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ চান। আহল আল-রায় এবং অধিকাংশ সদস্য তাঁকে মদীনা অবস্থান করা এবং অন্য কোন সাহাবীকে সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করার পরামর্শ দেন। তিনি পুনরায় সাধারণ সভা আহবান করে সকলকে জানান যে, যারা সৎ পরামর্শ দেবে তাদেরকে মান্য করা কর্তব্য। তিন ঘোষণা করেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের জন্য সকল ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শে প্রতিয়মান হচেছ যে, তাঁর রাজধানীতে অবস্থান করে কোন সাহাবীকে সেনা পতিত্ব প্রদান করা মঙ্গলজনক। কেননা স্বয়ং খলীফার পরাজয় হলে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে পড়তে পারে। বরং তিনি সৈন্য সংগ্রহ করে পরপর যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রেরণ করলে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে। সকল লোক তাঁর যুক্তি অনুধাবন করেন। এবং সাদ ইবন আবী ওয়াককাসকে সেনাপতি হিসেবে ইরাকে প্রেরণ করে তিনি স্বয়ং মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

দ্বিতীয়বার: সিরিয়া ইরাক বিজয়ের পর উক্ত অঞ্চলের কৃষিভূমি সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করবেন, না উহা পূর্বের মালীকদের হাতে রাখবেন। এ বিষয়ে মীমাংসা করার জন্য তিনি দ্বিতীয়বার সভার বৈঠক আহবান করেন। খলীফা উমর ভূমির মূল মালিকদের বঞ্চিত করার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি দুইটি কারণে পূর্বের মালিকদের মধ্যে ভূমি বন্টনের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমত: তিনি প্রশাসনিক কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনী নিয়মিত করার জন্য রাষ্ট্রের

নিয়মিত আয়ের পক্ষপাতি ছিলেন। মুসলমানরে মধ্যে উক্ত সম্পত্তি বন্টন করে দিলে রাষ্ট্র খারাজ হতে বঞ্চিত হবে।

দ্বিতীয়ত: প্রকৃত ভূমি মালিকদের বঞ্চিত করে আরবদের মধ্যে বন্টন করার অর্থ তাদেরকে দৈন্যের মধ্যে ঠেলে দেয়। আর তা রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক ছিল না । এ ব্যাপারে তাঁর আরো একটি মহান উদ্দেশ্য ছিল বলে জানা যায়। তিনি আরবদের বিশুদ্ধ সামরিক জাতি হিসেবে গড়ে তোলার পক্ষপাত ছিলেন। কৃষি ভূমি তাদের মধ্যে বন্টন করলে তারা আরামপ্রিয় হয়ে পড়তো। তা নিঃসন্দেহে জাতির জন্য অমঙ্গল ও ক্ষতিজনক।

হযরত উমর (রাঃ) পরামর্শ সভার সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের মতামতের উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, এই মজলিসে শূরায় উল্লেখযোগ্য বড় বড় সাহাবীদের মধ্যে হযরত উসমান, আলী, আব্বাস, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত মু'য়াজ ইবনে জাবাল, হযরত উবাই ইবনে কাব, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)সহ প্রমুখ সাহাবী সদস্য হিসেবে ছিলেন।

এ মজলিসে শূরা ছাড়াও আরও দু'টি মজলিস ছিল। যথা- মজলিসে আম (সাধারণ পরিষদ) ও মজলিসে খাস (বিশেষ পরিষদ)।

মজলিসে আম ও মজলিসে খাস ঃ মজলিসে-আম (সাধারণ পরিষদ) নবী করীম (সঃ)-এর ঘনিষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবা এবং মুহাজির, আনসার, মদীনার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ ও বেদুঈন দলপতিগণ নিয়ে গঠিত ছিল। আর মজলিসে খাস (বিশেষ পরিষদ) শুধু মুহাজিরদের নিয়ে গঠিত ছিল।

মজলিসে শূরার অধিবেশনের নিয়ম ছিল- আহবান কারী الصلاة جامعة (নামায প্রস্তুত) বলে ঘোষণা করতেন। জনসাধারণ মসজিদে নববীতে সমবেত হতেন। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) তথায় পৌঁছে সকলকে নিয়ে প্রথমে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতেন এবং মিম্বরে আরোহণ করে উদ্ভূত সমস্যার উপর বক্তৃতা করতেন। নমুনা হিসেবে তাঁর বক্তৃতার কয়েকটি বাক্য নীচে উদ্ধৃত করা হল-

"ইয়াতীমের ধন-সম্পতিতে তাঁর অভিভাবকের যে পর্যায়ের অধিকার রয়েছে তোমাদের সম্পদে তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদে আমার অধিকারও সেই পর্যায়ের। আমি ধনী হয়ে থাকলে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না, আর যদি আমি অভাবী হয়ে থাকি তাহলে তা থেকে ন্যায় সঙ্গতভাবে গ্রহণ করবো। বন্ধুগণ ! আমার উপর তোমাদের অসংখ্য অধিকার রয়েছে। আমার নিকট থেকে তোমাদের সেগুলো দাবি করা উচিত। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ঃ তোমাদের ভাতা বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয় হচ্ছে, তোমাদের সীমান্ত সংরক্ষণ করা, তৃতীয় হচ্ছে, তোমাদের বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ না করা।"

উন্মুক্ত আলোচনার জন্য সকল বিষয়বস্তু সদস্যদের সম্মুখে পেশ করতেন। এমন কি প্রয়োজনে খলীফার সমালোচনারও সাধারণ অনুমতি ছিল। হযরত উমর (রাঃ) বলতেন ঃ "পরামর্শ ছাড়া খিলাফত তথা রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ সুষ্ঠুভাবে হতে পারে না।"

সাধারণতঃ মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে বড় বড় পদে লোক নিযুক্ত করা হতো। হযরত উমর (রাঃ) কোন এক জন যোগ্য আমানতদার, বিশ্বস্ত ও সত্যনিষ্ঠ লোকের নাম পেশ করতেন। যেহেতো হযরত উমরের মধ্যে মানুষ চেনার অদ্ভ ত বিচক্ষনতা ছিল। তাই মজলিসে শূরার সদস্যগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর নির্বাচনের প্রতি সমর্থন জানাতেন। এভাবে মজলিসে শূরার সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে লোক নির্বাচন ও সকল বিষয়ে ফয়সালা করতেন।

প্রশাসনিক কাঠামো

সাম্রাজ্য বিভাগ ঃ হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন ইসলামের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সময় ইসলামী সামরাজ্যের বিস্তৃতির ফলে গোটা ইসলামী সামরাজ্যকে মোট আটটি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। এ প্রদেশগুলো ঃ মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, জাযীরা, বসরা, কুফা, মিসর ও ফিলিস্তীন।

ঐতিহাসিক হোসাইনীর মতে হযরত উমরের সাম্রাজ্য ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, জাযিরা, বসরা, কুফা, মিসর, ফিলিস্তীন, পারস্য, ইরান, কিরমান, খোরাসান, মাকরান, সিজিস্তান ও আজারবাইজান। ঐতিহাসিক শিবলী নোমানীর মতে প্রদেশের সংখ্যা ছিল ৪টি।

ওয়ালী, আমিল ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ঃ খলীফা উমর (রাঃ)-এর শাসন ব্যবস্থায় প্রদেশ ও জেলার শাসনকর্তাকে যথাক্রমে ওয়ালী বা আমিল বলা হতো। ওয়ালী শুধু প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তা যারা তাকে সাহায্য করতেন তারা ছিলেন কাতিব (সচিব)

কাতিবউদ-দীওয়ান (প্রতিরক্ষা সচিব), সাহিবুল খারাজ (কালেক্টর), সাহিবুল এহদাস (পুলিশ-ইন্সপেক্টর জেনারেল), সাহিবু বায়তিলমাল (ট্রেজারার), কাজী এবং আরও অনেক কর্মকর্তা। পরবর্তী সময়ে হযরত উমর (রাঃ) অবশ্য রাজস্ব, বিচার ও সামরিক বিভাগকে প্রাদেশিক শাসনকর্তার এখতিয়ার থেকে পৃথক করে দেন।

ওয়ালী ও আমিলের দায়িত্ব ঃ হযরত উমর (রাঃ)-এর প্রশাসনে প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের বিশেষ করে ওয়ালী এবং আমিলদের নিয়োগের পূর্বে তিনি তাদের নিজ নিজ দাযিত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে নিয়োগপত্রে অবহিতো করতেন। তারা যাতে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনকালে কোন স্বৈরাচারী নীতি অনুসরণ না করেন তার জন্য তিনি জনসাধারণকেও তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতেন। দায়িত্ব পালনে কর্মচারীগণ কোন অবহেলা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি করলে তাদেরকে পদচ্যুত এবং ক্ষেত্র বিশেষ শাস্তিও প্রদান করা হতো।

হযরত উমর (রাঃ)-এর শাহাদাতের সময় নিম্নলিখিত ওয়ালীগণ (গর্ভণর) বিভিন্ন প্রদেশের দায়িত্বে ছিলেন ঃ

১। মক্কার গভর্নর ছিলেন নাফে ইবনে আবুল হারেস খাযায়ী, ২। মিসরে আমর ইবনুল আস, ৩। তায়েফে সুফিয়ান ইবনে আবদুল হাক্কাফী, ৪। দামেস্কে মুয়াবিয়া, ৫। কুফায় মুগীরা ইবনে শো'বা, ৬। হিমসে উমায়ের ইবনে সা'দ, ৭। বসরায় আবু মূসা আল-আশআরী, ৮। বাহরাইনে উসমান ইবনে আবিল আ'স।

কর্মচারী নিয়োগ ঃ হযরত উমর (রাঃ) গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে লোক নিয়োগ করার ক্ষেত্রে মজলিসে শূরার পরামর্শ নিতেন।

কর্মচারীদেরকে উপযুক্ত বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেয়া হতো। যাতে অবৈধভাবে অর্থোপার্জনের প্রতি কোন প্রকার লোভ স্বার্থ না হয়। কর্মচারী নিয়োগের পরও তাদের গতি বিধির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন, যেন জনগণের উপর তারা অত্যাচার করতে না পারে। কর্মচারী নিয়োগের পর নিম্নলিখিত উপদেশাবলী দেয়া হতো। এমনকি কোন কোন সময় তা নিয়োগপত্রে উল্লেখ থাকত-

১। অতি মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছেদ পরতে পারবে না।

২। দামী রুটি বা খাবার খাবে না।

৩। বাড়ীর দরজায় কোন দারোয়ান রাখতে পারবে না, যাতে কোন সমস্যাগ্রস্ত লোক ইবনা বাধায় সংলিষ্ট দায়িত্বশীলকে তাঁর বক্তব্য জানাতে পারে।

৪। অসুস্থকে দেখতে যাবে আর মৃত ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হবে।

৫। কখনো উৎকৃষ্ট তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করবে না।

উল্লেখিত উপদেশাবলী জনসাধারণের সম্মুখে পড়ে শুনানো হতো যাতে কোন ব্যতিক্রম দেখা দিলে তাঁরা খলীফাকে অবগত করতে পারে। সেই যুগে অনেকে রাষ্ট্রের সেবা করে বেতন নেয়াকে নৈতিকতার পরিপন্থী বলে মনে করতেন। হযরত উমর (রাঃ) এ ধারণার নিরসন করে, প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন।

হযরত উমর (রাঃ) সকল কর্মচারীকে হজ্জের সময় মক্কাতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিতেন। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রের প্রত্যেক এলাকা হতে অসংখ্য লোক মক্কায় সমবেত হতো। হযরত উমর (রাঃ) স্বয়ং সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলতেন। কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সামান্য অভিযোগ থাকলেও আপনারা তা পেশ করতে পারেন।

কর্মচারীদের দূর্নীতিমুক্ত রাখার পদক্ষেপ ঃ সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্য নিয়োগের পরই প্রত্যেককে তার স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির একটি তালিকা খলীফার নিকট পেশ করতে হতো। চাকরিকালে যদি কারও সম্পত্তি আয়ের অনুপাতে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেত, তাহলে অতিরিক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হতো। কর্মচারীগণ যাতে কোনরূপ অসদুপায় অবলম্বন করতে না পারে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য হযরত উমর (রাঃ)-তাঁর দপ্তরে বিশেষ বিভাগ প্রবর্তন করেন। তিনি প্রত্যেক কর্মচারীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও মেধা অনুযায়ী তাঁর বেতন নির্ধারণ করতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার দিরহাম পর্যন্ত ভাতা দেয়া হতো।

জেলা প্রশাসন ঃ হযরত উমর (রাঃ)-এর প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার অধীনে আমিল (জেলা প্রশাসক), কাযী (বিচারক) ও সাহিবে বায়তুলমাল (কোষাধ্যক্ষ) তাদের স্ব স্ব কার্য সম্পাদন ও কর্তব্য পালন করতেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তার সত্যতা যাচাই করার জন্য নির্দিষ্ট কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। খলীফার নিকট তার পেশকৃত তথ্যাবলির ভিত্তিতে তিনি অভিযোগের যথাযথ প্রতিকার করতনে।

রাজস্ব বিভাগ

রাজস্ব বিভাগ প্রবর্তন হযরত উমরের অবিস্মরণীয় কীর্তি। কেননা এক্ষেত্রে তিনি এক বৈপ- বিক পরিবর্তন সাধন করেন। রাসূলে করীমের সময় এবং হযরত আবু বকরের খিলাফত কালে রাজস্ব আদায়ের কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময়ে শুধু মুসলমানদেরকে উশর (উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ) অথবা নিসফুল উশর (এক বিশমাংশ) প্রদান করতে হতো। জমির উপর এককালীন কিছু অর্থ আদায় ব্যতীত আবু বকরের (র) আমলে নির্দিষ্ট কোন কর ধার্য করা হয়নি। হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফত আমলে রাজস্ব আদায়ের জন্য স্বতন্ ও স্থায়ীভাবে লোক নিয়োগ করা হতো। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উপর সাধারণতঃ রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পন করা হতো না। আদায়কৃত রাজস্ব খলীফার নির্দেশ অনুসারে সৈনিকদের বেতন-ভাতা ও জনকল্যাণমূলক অন্যান্য সার্বজনীন কাজ-কর্মে ব্যয় করা হতো। উদ্ধৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজধানীতে প্রেরণ করা হতো। তাঁর খিলাফত আমলে দু'প্রকারের রাজস্ব ধার্য করা হতো ঃ (১) স্থায়ী ও (২) অস্থায়ী। স্থায়ী রাজস্বের মধ্যে যাকাত, উশর ও জিজিয়া উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে গণীমতের মাল ছিল অস্থায়ী রাজস্ব বা রাষ্ট্রীয় আয়।

বায়তুলমাল ঃ বাইতুল মাল (কোষাগার)-এর প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠন উমরের (রা) অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। তাঁর খিলাফতের পূর্বে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব থাকলেও একটি নিয়মিত ও সুসংগঠিত রাজস্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোন ভূমিকা ছিল না। খলীফা উমর ওয়ালিদ ইবন হিশামের পরামর্শে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা এবং এটিকে একটি কার্যকরী জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। জনসাধারণের সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত বায়তুলমালে খলীফার কোন অধিকার ছিল না। তিনি ছিলেন এর রক্ষক মাত্র। বায়তুলমালে জমা করা অর্থ রাষ্ট্রের মুসলমান জনগণের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো।

১৮ হিজরীতে আরব ভূমিতে দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হযরত উমর (রাঃ) এ বিপর্যয় থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য যে প্রচেষ্টা চালান তা ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি বায়তুলমালের সমস্ নগদ অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ ব্যয় করেন। সমস্ত প্রদেশ থেকে শস্য সংগ্রহ করেন এবং সুষ্ঠুভাবে দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকায় তা বিতরণ করেন। বেওয়ারিশ শিশুদের দুধ পান ও লালন-পালন করার ব্যবস্থা করেন। গরীব মিসকিনদের জন্য মাসোহারা নির্ধারণ করেন এবং মিম্বরে উঠে একথা ঘোষণা করেন ঃ

"আমি প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য প্রতি মাসে (নির্দিষ্ট পরিমাণ) গম ও (নির্দিষ্ট পরিমাণ) সিরকা নির্ধারণ করছি। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ঃ কৃতদাসের জন্যও কি একই ব্যবস্থা ? জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, কৃতদাসের জন্যও একই ব্যবস্থা, কিন্তু এভাবে সরকারী দান-খয়রাত খেতে খেতে মানুষ কুড়ে ও কর্ম বিমুখ হয়ে যাবে, একথা হযরত উমর জানতেন না ধারণা করা উচিত হবে না। আসলে তিনি, সমর বিভাগে কাজ করার অযোগ্য বা শারীরিক দূর্বলতার কারণে কাজ কর্ম করতে অক্ষম ব্যক্তিদেরই মাসোহারা নির্ধারণ করেন।"

বায়তুলমালের প্রধান কর্মচারীর উপাধি ছিল সাহিবু বায়তিলমাল। তিনি তার কাজের জন্য খলীফার নিকট দায়ী থাকতেন।

দিওয়ান প্রতিষ্ঠা ঃ খলীফা উমর (রা) ভূমি রাজস্বের সুপরিকল্পিত পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য দীওয়ান-উল-খারাজ (রাজস্ব বিভাগ) নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজস্ব বিভাগই সংক্ষেপে উমরের 'দিওয়ান' নামে পরিচিত। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও খলীফা আবু বকরের শাসনকাল পর্যন্ত অর্থ দফতরকে বায়তুলমাল বলা হতো। উমর (রা) পারসিক কায়দায় এই দফতরের নাম রাখেন দিওয়ান। বৃহত্তর জনসমষ্টির মঙ্গল সাধন করা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করে তিনি অর্থ বিভাগের পূনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। তাঁর সময়ে ইসলামী প্রজা তন্ত্রের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে রাজস্ব বিভাগ পরিচালনায় অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। এসব অসুবিধা দূর করার জন্য তিনি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জাতীয় অর্থের সুষ্ঠু বন্টনের জন্য তিনি সর্ব প্রথম আদমশুমারির প্রচলন করেন। লোক গণনার মাধ্যমে প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় ভাতা-ভোগীর নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ইসলামের সেবায় নিয়োজিত প্রত্যেকটি আরব ও অনারব মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ সকলেই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অক্ষম, পঙ্গু, দুর্বল, রুগ্ন প্রভৃতি ব্যক্তিদের বায়তুলমাল থেকে বিশেষ ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। তিনি সকল মুসলিমকে বায়তুলমালের মালিক বলে ঘোষণা করেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অমুসলিমগণও এই ভাতা থেকে বঞ্চিত হতো না। ভাতা প্রদানের সুবিধার্থে মুসলিমদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়- ১. রাসূলের আত্মীয় পরিজন, ২. ইসলামের প্রাথমিক যুগের নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম ও ইসলামের সাহায্যকারিগণ।

কৃষি উন্নয়ন ঃ কৃষি উন্নয়নে হযরত উমর (রাঃ)-এর অবদান অতুলনীয়। তিনি খাল খনন করে পানি সেচের ব্যবস্থা করেন। ক্যালদিয়ায় তিনি খাল খননের ব্যবস্থা করেন। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের উপর বহু দিনের অবহেলিত বাঁধ নির্মাণ কাজের দায়িত্ব তিনি সুযোগ্য অফিসারদের হাতে ন্যস্ত করেন। মাকরিজির হিসেবে অনুযায়ী ১,২০,০০০ শ্রমিক সেচ কার্যে নিয়োজিত থাকত এবং তারা নিয়মিত বেতন পেত। হযরত উমর (রাঃ) অনাবাদী জমিগুলো চাষের আওতায় এনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করেন।

রাজস্বনীতি ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ঃ রাজ্য সম্প্রসারণের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে খলীফা উমর (র) রাজস্ব ব্যবস্থার দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি বিজিত অঞ্চল মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে জায়গীর হিসেবে বন্টনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কেননা, তাঁর মতে এই বন্টনে একদিকে যেমন কৃষিকাজের উন্নতি ব্যাহতো হতো, অন্যদিকে সৈন্যদের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ইবনষ্ট হতো এবং তারা শক্তিহীন হয়ে পড়তো। তিনি প্রাচীন শোষণমূলক ভূস্বত্ব ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে স্থানীয় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটান।

উমর (রা) একবার প্রথম আদমশুমারি করে দেখলেন, প্রতি একজন মুসলিম সৈন্যের ভাগে তিনজন করে মাত্র বিজিতলোক পড়ে। তাই তিনি বিজিত এলাকার ভূমি ও জমিদারী স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে রাজস্ব নির্ধারণ করে দেন। ফলে বিজিত এলাকা সকল সময়ের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে থেকে গেল এবং উক্ত এলাকার পূর্বের স্বত্বাধিকারিগণ ভূমিহীন হওয়া থেকে রেহাই পায়। উমর (রা) বিজিত অঞ্চলে মুসলমানদের ভূ-সম্পত্তি ক্রয় নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি এ সব এলাকায় যে সব বিজয়ী মুসলিম ইত:পূর্বে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল তাদের জন্যও কৃষিকাজ বন্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর এ ব্যবস্থার ফলে কৃষিকার্যের অভূতপূর্ব উন্নতি ও কৃষক সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

ভূমি জরিপ, বন্টন, বন্দোবস্ত, রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় ঃ খলীফা উমর (রা) প্রথমে ইরাকের ভূমি জরিপ করে সুষ্ঠু বন্টনের ব্যবস্থা করেন। জরিপ কার্য সম্পন্ন করার পর তিনি জমির বিলি-বন্দোবস্ত ও কর নির্ধারণ করেন। ভূমির উর্বরতার পার্থক্যের ওপর রাজস্বের হারের তারতম্য ঘটত। নগদ অর্থে বা উৎপন্ন ফসলের মাধ্যমে এককালীন কিংবা কিস্তিতে কর প্রদান করা যেত। এই কর কেবল বিজিত অঞ্চলের অমুসলিম কৃষকদের নিকট থেকে আদায় করা হতো। জরিপ কর্মচারীদের ত্রুটির জন্য অনেক জায়গায় কর নির্ধারণে কিছু গরমিল হতো। এরূপ ক্ষেত্রে জমির মালিকের প্রতি যাতে কোন অবিচার না হয় তার জন্য তাকে যথেষ্ট পরিমাণ জমি লাখেরাজ হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হতো। ইরাকের ন্যায় সিরিয়া ও মিসরেও ভূমি রাজস্বের আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। পারস্যে প্রাচীন রাজস্ব ব্যবস্থাই বহাল ছিল। চাষাবাদযোগ্য ইরাকী জমির আনুমানিক পরিমাণ ছিল ৩,৬০,০০,০০০ জরীব। এই জমি থেকে বাৎসরিক রাজস্ব আদায় হতো ৮,৬০,০০,০০০ দিরহাম। পরে অবশ্য রাজস্বের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়।

বিচার বিভাগ

ক্ষমতা পৃথকীকরণ ও কাযীর উপর বিচার ব্যবস্থা ন্যস্ত ঃ বিচার ব্যবস্থার সংস্কার হযরত উমরের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এই বিভাগের গঠন, প্রকৃতি ও উন্নতিতে তাঁর প্রশাসনিক মেধার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনিই সর্বপ্রথম বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। এযাবৎ ওয়ালী (প্রাদেশিক শাসনকর্তা) বিচার বিভাগের কার্যাবলী পরিচালনা করতেন। কিন্তু খলীফা উমর বিচার ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কাযীর ওপর ন্যাস্ত করেন। কাযী ওয়ালীর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। কুরআনের নির্দেশের আলোকে কাযীকে বিচারের রায় প্রদান করতে হতো। কুরআনে সুস্পষ্ট কোন নির্দশ পাওয়া না গেলে হাদিস এবং হাদীসের পর ইজমা ও কিয়াসের উপর নির্ভর করতে হতো। বিখ্যাত কাযী শুরাইয়ার নিকট এক লিখিত পত্রে হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন-

"He should follow the Quran! Should that in the absence of elcar instructions in the holy book, he should seek guidance from the traditions of the prophet; that lacking any precedence on any particular topic, he should have resort to the conscnsus of opinion (at lima) of the scholars (already expressed on various topics) and that lacking any guidance even in the ijma he should depend on his own common serse".

বিচারকের যোগ্যতা ঃ ইসলামী আইন অনুযায়ী একজন কাযীকে হতে হতো প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, মুসলিম, স্বাধীন নাগরিক, চরিত্রবান, শ্রবণশীল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, আইন বিশেষজ্ঞ, সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও কুরআন এবং হাদীসের বুৎপত্তি সম্পন্ন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের দৃষ্টিতে সমতা বিধানই চিল হযরত উমর (রাঃ)-এর শাসন আমলের উল্লেখযোগ্য বিষয়। ধনি-দরীদ্র, রাজা-প্রজা, আত্মীয়-অনাত্মীয়, উঁচু-নিচু, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনসাধারণ যেন সমান বিচার ও মর্যাদা পায় এ ছিল বিচার বিভাগের লক্ষ্য। যে বিচারালয়ে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রকৃত সাম্যের ব্যবস্থা নেই, সেখানে সুবিচার আশা করা যায় না। এখানে বিচার হল প্রহসন মাত্র। হযরত উমর (রাঃ) অতি গুরুত্ব সহকারে এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁর এ সদিচ্ছা পূর্ণ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য অনেক সময় বাদী বা বিবাদী হয়ে বিচারালয়ে হাজির হতেন।

বিচারালয় প্রতিষ্ঠা ঃ হযরত উমর (রা) তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্যে বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মজলিস-এ-শূরার পরামর্শক্রমে কাযী নিয়োগ করেন। এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্যও তাদের ধর্মীয় আইন সম্মত বিচার পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত আদালতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিচার সম্পর্কীয় মূলনীতি ঃ হযরত উমর (রা)-এর বিচার সম্পর্কীয় যে মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যায় তা নিম্নরূপঃ

১. কাযীকে বিচারক হিসেবে প্রত্যেক মানুষের সাথে সমান ব্যবহার করতে হবে।
২. সাধারণত সাক্ষ্য প্রমাণের দায়িত্ব বাদীর উপর।
৩. বিবাদীর যদি কোন প্রকার সাফাই না থাকে তাহলে তাকে শপথ করতে হবে।
৪. উভয় পক্ষ সর্বাবস্থায় আপোস নিস্পত্তি করতে পারে। তবে আইনের বিরোধী কোন ব্যাপারে আপোস হতে পারবে না।
৫. মামলার রায় প্রদান করার পর বিচারক ইচ্ছা করলে এর পুনঃ বিবেচনা করতে পারবেন।
৬. মামলার শুনানীর জন্য নির্দিষ্ট একটি তারিখ থাকা প্রয়োজন।
৭. নির্দিষ্ট তারিখে যদি বিবাদী হাযির না হয় তবে মামলার রায় এক তরফা হয়ে যাবে।
৮. প্রত্যেক মুসলমানের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য তবে শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, এ মূলনীতি সম্পর্কে জনৈক রোমান পন্ডিত বলেছেন, এ আইনগুলো পৃথিবীর দার্শনিকদের অমূল্য গবেষণা হতেও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

কাযী উল কুযাত ঃ প্রত্যেক প্রদেশে একজন প্রধান কাযী নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁকে বলা হতো কাযী উল কুযাত। প্রত্যেক জেলাতেও একজন করে কাযী নিযুক্ত করা হয়েছিল। কাযীগণ যেন দুর্নীতিপরায়ণ না হয় সে জন্য তাঁদেরকে উচ্চ হারে বেতন প্রদান করা হতো। বিচারের জন্য কোন ফি লাগত না এবং বিচারকার্য মসজিদে অনুষ্ঠিত হতো।

বিচারের ক্ষেত্রে সমতা বিধান ঃ ন্যায় ও সুষ্ঠু বিচারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বিচারের ক্ষেত্রে সমতা বিধান ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু নির্বিশেষে সকলকে সমান মর্যাদা দেয়া। বস্তুত যে বিচারালয়ে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রকৃত সাম্যের ব্যবস্থা নেই সেখানে সুবিচার না হয়ে বিচারের প্রহসন হয় মাত্র। হযরত উমর (রাঃ) অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি অনেক সময় ছদ্মবেশে বিচারালয়ে হাযির হতেন। তিনি সব সময় ন্যায় বিচারের পক্ষে ছিলেন। মদ্যপানের অপরাধে তাঁর পুত্রকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতেও ছাড়েন নি। অর্থ অপব্যয়ের অভিযোগে তিনি সেনাপতি খালিদের বিচার করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি স্বয়ং মদীনার বাজারে ও রাস্তায় চাবুক হস্তে ঘুরে বেড়াতেন এবং কোন দুস্কৃতিকারী ধরা পড়লে তাকে যথাস্থানেই শাস্তি প্রদান করতেন। "Omar's whip is more terrible than another's sword" পদাধিকার বলে কোন ব্যক্তি বিচারের রায় হতে মুক্ত হতে পারতো না। বসরা, কুফা, দামেস্ক, হিমসের জন্য বিশেষ বিচারক নিয়োগ করা হয়েছিল। অমুসলমানদের বিচার কাজ তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী পরিচালিত ছিল।

ফাতওয়া বিভাগ

আইনের একটি সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, যদি কেউ অপরাধ করে কৈফিয়ত দেয় যে এটা অপরাধ বলে আমার জানা ছিল না। তবে এ কারণে তাকে কিছুতেই মুক্তি দেয়া যাবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে একথা মেনে নিতে হবে যে, রাষ্ট্রের আইন-কানুন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় অন্য কোন জাতিই এর ব্যবস্থা করেনি। বর্তমান ইউরোপসহ অনেক দেশই শিক্ষার সর্বোচ্চ মানে উপনীত হয়েছে। অথচ, সেখানেও জনসাধারণ অনেক আইন সম্পর্কে অজ্ঞ রয়ে গিয়েছে। ইসলামে এর একটি বিশেষ বিভাগ

ছিল। এ বিভাগকে সাধারনত ফতওয়া বিভাগ বলা হয়ে থাকে। হযরত উমর (রা) এ বিভাগটি অত্যন্ত সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেছেন তাঁর পূর্বাপর আর কোন যুগে এত উন্নত ব্যবস্থা দেখা যায়নি।

সামরিক বিভাগ

সামরিক বাহিনীকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্তি ঃ খলীফা উমর (রা) মুসলিম জাতিকে একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীতে পরিণত করার প্রয়াস পান। সামরিক বাহিনীকে সুসংহতো করা এবং যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকার জন্য তিনি একটি প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করেন। সামরিক শাসনের সুবিধার্থে ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে নয়টি সামরিক জেলায় (জুনদ) বিভক্ত করেন, যথা ঃ মদিনা, কুফা, বসরা, ফুসতাত, মিসর, দামেস্ক, হিমস, প্যালেস্টাইন ও মসুল। জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য প্রত্যেকটি জুনদে ৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বাহিনী সদা তৈরি থাকত। সেনাপতিদের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে খলীফা সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন।

খলীফা সর্বাধিনায়কঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পূর্ণাঙ্গ সৈন্য বাহিনী প্রবর্তন করেন খলীফা উমর (রা)। তাঁর সময়ে কেবল আরব মুসলমানগণের সেনাবাহিনীতে যোগদানের অধিকার ছিল। কাজেই সৈনিক বৃত্তি ছিল আরবদের আভিজাত্য। আর্থিক সঙ্গতি ও সামাজিক সম্মান লাভের অন্যতম উৎস। সেনা দফতরে সকল সৈন্যের নামে একটি তালিকা রাখা হতো। সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন খলীফা নিজেই। প্রত্যেক বাহিনীর অবশ্য নিজস্ব অধিনায়ক ছিল। সৈন্যবাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। কর্তব্যে অবহেলা, বিশ্বাসঘাতকতা ও ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য তাদেরকে কঠোর শাস্তিভোগ করতে হতো।

সৈন্যবাহিনীর শ্রেণী বিভাগ ঃ সৈন্যবাহিনীকে পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ, বাহক, সেবক প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা ছিল। রণক্ষেত্রে তারা অগ্র, মধ্য, পশ্চাৎ ও দুই বাহু হয়ে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করত। প্রতি দশ জন্য সৈন্যের উপর একজন 'আমীর' প্রতি দশজন আমীরের ওপর একজন 'কায়েদ' এবং প্রতি দশজন কায়েদের ওপর একজন 'আমির' নিযুক্ত থাকত। 'আহরা' নামক বিভাগের মাধ্যমে সৈন্যদের রসদ সরবরাহ করা হতো। যুদ্ধে সৈন্যরা তরবারি, বর্শা, বল্লম, তীর, ধনুক, ঢাল, বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করত।

বেতন সৈন্যদের ভাতা ঃ হযরত উমর (রাঃ) জায়গীরের পরিবর্তে সৈন্যদের নিয়মিত বেতন প্রদান করতেন। প্রত্যেক সৈন্যের প্রারম্ভিক বেতন ছিল প্রথম বছরে ২০০ এবং পরে ৩০০ দিরহাম। নিয়মিত বেতন ছাড়া সৈনিকগণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ ও উদ্বৃত্ত রাজস্বেরও অংশ লাভ করত। তাদেরকে ইবনামূল্যে খাদ্য ও পোশাক সরবরাহ করা হতো এবং তাদের পরিবার-পরিজন সরকারি কোষাগার থেকে ভাতা লাভ করত। সৈন্যগণ অসুস্থ হলে চিকিৎসার সরকারি সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত।

পুলিশ বিভাগ

শান্তিরক্ষা বাহিনী ঃ খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম দিকে স্বতন্ত্র কোন পুলিশ বিভাগের কথা জানা যায় না। অনেক ঐতিহাসিকের মতে হযরত উমরই সর্বপ্রথম একটি সুসংগঠিত পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। দীওয়ান-উল-আদালত নামে একটি দপতর এই বাহিনীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করত। জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা, অপরাধমূলক কাজ-কর্ম প্রতিরোধ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করাই ছিল পুলিশ বাহিনীর প্রধান কর্তব্য। তাছাড়া বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ে সততা বজায় রাখা, ওজন পরীক্ষা ও অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং মাদকদ্রব্য বিক্রয় ও প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা বন্ধ করাও এই বাহিনীর কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুলিশ বিভাগের প্রধানের নাম ছিল সাহিব-উল-আহদাস।

জেলখানা প্রতিষ্ঠা ঃ জেলখানা প্রতিষ্ঠা হযরত উমরের অন্যতম কৃতিত্ব। মদীনার কেন্দ্রীয় জেলখানা ব্যতীত তিনি প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানী ও জেলা সদরে একটি করে কয়েদখানা নির্মাণের আদেশ দান করেন। কেবল ফৌজদারী মামলার আসামীদের কারাদন্ড দেয়ার নিয়ম ছিল। অপরাধীকে শাস্তি স্বরূপ নির্বাসন দন্ড প্রদানও তাঁর সময় প্রবর্তিত হয়।

গোয়েন্দা বিভাগ

রাষ্ট্রের বিভিন্ন অবস্থা, কর্মচারীগণ কর্তৃক নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের যথাযথ পালন, রাষ্ট্রের মধ্যে কেউ না খেয়ে থাকে কিনা তার সঠিক খোঁজ খবর সংগ্রহ ইত্যাদি কাজের জন্য হযরত উমর (রা) বহু সংখ্যক গুপ্তচর ও পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) খোদ নিজেও মাঝে মাঝে গভীর রাতে মদীনার গলিতে বের

হতেন এবং জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করতেন। তাছাড়া জনসাধারণের জন্য হজ্জের সময় শাসকদের বিরূদ্ধে অভিযোগ করার সাধারণ অনুমতি ছিল।

দেশের অবস্থা অবগত হবার জন্য দেশের সর্বত্র সংবাদ সংগ্রহকারী ও রিপোর্টার নিয়োগ করেন। তাদের মাধ্যমে তিনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংবাদগুলোও সংগ্রহ করতেন। ঐতিহাসিক তারাবী লিখেছেন ঃ

"হযরত উমরের নিকট কোন কথা গোপন থাকতো না। ইরাকে যেসব বিদ্রোহ ঘটেছে এবং সিরিয়ায় যাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে তাদের সবার খবর তাঁকে লিখে জানানো হতো"।

সংবাদ সরবারাহ প্রতিষ্ঠান এত বেশী তৎপর ছিল যে, মিসরের শাসনকর্তা নোমান ইবনে আদী বিলাসিতায় লিপ্ত হন।

হযরত উমর (রা) এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিলাসিতার খবর জানতে পেরে নোমানকে পদচ্যুত করে লেখেন, হ্যাঁ, তোমাদের একাজ আমার খারাপ লেগেছে।

তদন্ত বিভাগ

সরকারী কর্মচারীদের বিরূদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্তের জন্য হযরত উমর (রা) একটি নতুন পদের সৃষ্টি করেন। মুহাম্মদ ইবনে আসলামা আনছারীকে এ পদে নিয়োগ করা হয়। কোন স্থান হতে কোন অভিযোগ আসলে খলীফা তৎক্ষণাৎ তাঁকে প্রেরণ করতেন। তিনি সরে জমিনে তা তদন্ত করতেন এবং স্থানীয় লোকজনের সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করে খলীফার নিকট বিবরণী পেশ করতেন। কর্মচারীদের চরিত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাই ছিল এ পদ সৃষ্টির অন্যতম লক্ষ্য।

গৃহ নির্মাণ ও পূর্তবিভাগ

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি যতই বিশাল আকার ধারণ করতে থাকে, বিভিন্ন আবাসিক ঘর-বাড়ি নির্মাণের কাজ ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে একার্য সম্পাদনের জন্য স্বতন্ত্র কোন বিভাগ ছিল না। তা সত্ত্বেও প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের দায়িত্বে একাজ সুষ্ঠুরূপে অগ্রসর হতে থাকে। প্রতিটি স্থানে অফিসারদের বসবাসের জন্য সরকারী আবাসিক এলাকা ও জনগণের সুযোগ-সুবিধার জন্য পুল, সড়ক ও মসজিদ নির্মিত হয়। পথিক ও প্রবাসীদের আশ্রয় নেয়ার জন্য মুসাফিরখানা তৈরি করা হয়। অনুরূপভাবে সামরিক প্রয়োজনে দুর্গ, ক্যাম্প ও ব্যারাকসমূহ নির্মাণ করা হয় এবং রাজকোষের হেফাজতের জন্য বায়তুলমাল বা খাজাঞ্চীখানার ইমারত তৈরি করা হয়। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে হযরত উমর (রা)-এর ব্যয়-সংকোচন নীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা সত্ত্বেও বায়তুলমালের প্রাসাদ সাধারণতঃ বেশী মজবুত ও জাঁক-জমকভাবে তৈরি করা হয়।

মক্কা ও মদীনার মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের কারণে উভয় শহরের যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত সুগম ও শান্তিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। তিনি মক্কা হতে মদীনা পর্যন্ত দীর্ঘ পথের পাশে অনেকগুলো পুলিশী পাহারা, সরাইখানা ও ঝর্ণাধারা নির্মাণ করেন।

কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য খলীফা সমগ্র দেশে কূপ বা খাল খনন করেন এবং সেচকার্য সম্পাদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন। বসরায় মিষ্টি পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে নদী হতে খাল খনন করা হয়। এ খালের দৈর্ঘ ছিল প্রায় নয় মাইল। এ প্রসঙ্গে নহরে মা'কাল, নহরে মায়াদ ও নহরে আমীরুল মু'মিনীন এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হিজরী সনের প্রবর্তন ও মদীনার মসজীদের সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন। পবিত্র কাবা গৃহও তার সময় পুনঃ নির্মাণ করা হয়।

শহর নির্মাণ

আরবের মরুভূমি হতে বিশ্ব বিজয়ী শক্তি হিসেবে মুসলমানগণ যখন বহির্বিশ্বে পদার্পণ করেন। তখন অন্যান্য দেশের সবুজ-শ্যামল ও মনোরম দৃশ্য তাদেরকে মুগ্ধ করে। ইসলামী আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হতে বিভিন্ন সরকারী কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তারা রাজধানী মদীনা হতে বহু দূর দূরাঞ্চলে বসবাস করতে বাধ্য হয়। এর ফলে তাদের দ্বারা প্রতিবেশী দেশগুলো বিভন্ন শহর ও নগর গড়ে ওঠে। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত কালে বসরা, কূফা, ফুস্তাত, মূসেল প্রভৃতি ইতিহাস বিখ্যাত নগর স্থাপিত হয়। বসরা শহরে প্রথমে মাত্র আটশত লোক বসবাস শুরু করে। পরে অল্প দিনের মধ্যে অধিবাসীদের সংখ্যা প্রায়

এক লাখ বিশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে এ শহর শতাব্দীকাল পর্যন্ত মুসলমানদের গৌরবের বস্তু হয়ে থাকবে।

ইরাকের জনৈক আরব শাসনকর্তা রাজধানী পুনঃনির্মাণ করায় কুফা নগরের সৃষ্টি হয়। এ শহরে চল্লিশ হাজার লোকের বাসোপযোগী গৃহাদি নির্মাণ করা হয়। হযরত উমর (রাঃ)-এর নির্দেশক্রমে এর সড়কসমূহ চল্লিশ হাত প্রশস্ত করা হয়। এখানে যে জামে মসজিদ নির্মিত হয়, তাতে একসঙ্গে চল্লিশ হাজার মুসলমান নামায আদায় করতে পারত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে এ শহরের ঐতিহাসিক মর্যাদা সর্বজন বিদিত।

ফুস্তাত শহর নির্মাণের ইতিহাস অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। মিসর বিজয়ী, হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) নীল নদ ও মালতাস পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। এ সময় ঘটনাবশত একটি কবুতর তাঁর তাবুতে নীড় রচনা করে। হযরত আমর (রাঃ) যখন এস্থান ত্যাগ করে যেতে ছিলেন। তখন এ অতিথির শান্ত নীড়ে কোনরূপ ব্যাঘাত যেন সৃষ্টি না হয় সে চিন্তায় তিনি তাঁবুটিকে যথাযথভাবে দাঁড় করে রাখলেন। উত্তর কালে এই তাঁবুকে কেন্দ্র করেই ফুস্তাত শহর গড়ে উঠে। চতুর্থ শতাব্দীর জনৈক পর্যটক এ শহর সম্পর্কে লিখেছেন এ শহর বাগদাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পাশ্চাত্যের কেন্দ্র ও ইসলামের গৌরব। এখানকার মসজিদ অপেক্ষা মুসলিম জাহানের আর কোন মসজিদে জ্ঞান বিজ্ঞানের এত আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নি।।

মুসেল শহর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন স্থলে অবস্থিত ; এ দৃষ্টিতেই সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে নির্মিত এ শহরের নামকরণ হয়েছে। অজ পাড়াগাঁকে বিরাট শহরে পরিণত করার এটি একটি বাস্তব নিদর্শন। হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশে এখানে একটি বিশাল জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) সমুদ্রোপকূলে কিছু সংখ্যক সৈন্য চেয়েছেন। কেননা সমুদ্র পথে রোমান শত্রুদের আক্রমণের ভয় ছিল। উত্তর কালে এখানে একটি বিরাট উপনিবেশ গড়ে ওঠেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত উমর (র)- এর আমলে কয়টি শহর বিজিত হয়েছিল

ক. ১০৮৬টি; খ. ১০৩৬টি;
গ. ৯৭৭টি; ঘ. ৪৮৩টি।

২. বিশেষ পরিষদ গঠিত হয়েছে-

ক. মুহাজির ও আনসারদেরকে নিয়ে; খ. শুধু মুহাজেরদেরকে নিয়ে;
গ. মদীনার বিশিষ্ট নাগরিকদেরক নিয়ে; ঘ. নবী করীম (স.)-এর ঘনিষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবা নিয়ে।

৩. আমিল কার উপাধি?

ক. প্রাদেশিক শাসনকর্তার; খ. জেলার শাসনকর্তার;
গ. গভর্নরের; ঘ. কাযীর।

৪. জিযিয়া অর্থ কি?

ক. রাজস্ব কর; খ. প্রতিরক্ষা কর;
গ. ভূমিকর; ঘ. এক প্রকার ভূমিকর।

৫. হযরত উমরের শাসন আমলে কত হিজরীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়?

ক. ১৬ হিজরীতে; খ. ১৭ হিজরীতে;
গ. ১৯ হিজরীতে; ঘ. ১৪ হিজরীতে।

এক কথায় উত্তর দিন

১. হযরত উমর (রা) এর আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা মক্কার দক্ষিণ দিকে কত মাইল বিস্তৃত ছিল?
২. হযরত উমরের সাম্রাজ্য কয়টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল?
৩. হযরত উমরের শাসনামলে আমর ইবনুল আস কোন প্রদেশের গভর্নর ছিলেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে হযরত উমর (রা)-এর উপদেশাবলী সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।
২. হযরত উমর (রা)-এর বিচার সম্পর্কিত মূলনীতি আলোচনা করুন।
৩. ইসলামী শরীআতে একজন কাযীর কী ধরনের যোগ্যতা প্রয়োজন? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. হযরত উমর (রা) এর প্রশাসনিক ব্যবস্থা কেমন ছিল? তার বিস্তারিত বিবরণ দিন।
২. হযরত উমরের (রা) রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৩. হযরত উমরের (রা) বিচার বিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা দিন।